ভূমিকা

ক. পরিচ্ছেদ

খ. পরিচ্ছেদ

গ. পরিচ্ছেদ

ঘ. পরিচ্ছেদ

ঙ. পরিচ্ছেদ

ভূমিকা — ক. পরিচ্ছেদ

ভাব বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ভাষাসাহিত্য ; তথ্যসাহিত্য — রম্যসাহিত্য — কথাসাহিত্য — পত্রসাহিত্য — পত্রোপন্যাস ; পত্র-চিঠি, পত্র ও পত্রিকা ; চিঠির প্রকারভেদ ; সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন নামাঙ্কিত পত্র ; প্রাচীনযুগে পত্র বিনিময় ও ব্যবহার ; প্রাচীন সাহিত্যে পত্র ; মধ্যযুগে তথা মুসলমান আমলে পত্রের ব্যবহার ও ডাক ব্যবস্থা — ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংবাদপূর্ণ পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি ; পত্রের ভাষা-ব্যবহারে গদ্য ; ব্রিটিশ যুগে তথা আধুনিক কালে স্বচ্ছন্দ ডাক ব্যবস্থা — সাধারণ মানুষ ও সাহিত্যিকদের পত্র রচনায় উৎসাহবৃদ্ধি — পত্র রচনায় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ভূমিকা — পত্র সংকলন ; পদ্যভাষা — কথাসাহিত্য ও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার ভাষা — পত্রসাহিত্য — কথাসাহিত্য তথা পত্রোপন্যাস।

যুগে যুগে মানুষ পরস্পর হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুলেছে। ভাব বিনিময় ঘটে ভাব প্রকাশে। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে এসেছে ভাষা-সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলা ইত্যাদি। তবে বলা যায়, ভাষা-সাহিত্যই এদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। [১]

"ভাষা হইল এমন বাক্‌ময় ধ্বনির্ভর সংকেতধর্মী প্রকাশ যাহার রীতিসিদ্ধ প্রচলিতি গড়িয়া উঠে সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। কতকগুলি ধ্বনি বা স্তর সমবায়েই ভাষা রচিত হয় না। সেগুলি যদি কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর নিকট বিশেষ অর্থবহ হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে বলা যায় ভাষা।" [২]

সাহিত্যের [৩] বাহন ভাষা। সাহিত্যের ভাষা আবার দু'ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তথ্যভিত্তিক এবং অনুভূতি-ভিত্তিক পরিবেশন — যা হৃদয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত। তথ্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে ভাষার তথ্যভিত্তিক পরিবেশনায় এবং রসসাহিত্যের ভিত্তি গড়ে উঠে অনুভূতিকে আশ্রয় করে। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসকে তথ্যসাহিত্য এবং কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটককে রসসাহিত্য বলা হয়। গল্প উপন্যাস কথা-সাহিত্য নামে চিহ্নিত। রসসাহিত্যের অন্যতম শাখা পত্রসাহিত্য; আবার পত্র রচনার আঙ্গিকে যে উপন্যাস রচিত হয় তা-ই পত্রোপন্যাস নামে চিহ্নিত।

পত্র, চিঠি, লিপি ও পত্রিকা সমার্থক। পত্র শব্দের বুৎপত্তি —√পত্ + ত্র (ষ্ট্রন্)-ক। পত্রের আভিধানিক অর্থ —

"১. যাহা পড়ে; পর্ণ পাতা। .....
২. পুষ্পদল, পাপড়ি .....
৩. লেখন স্থান পাতা, কাগজ ....
৪. লিপি, চিঠি.....
৫. পুস্তকের পাতা বা পৃষ্ঠা ....
৬. লেখ্য দলিল ....
৭. ধাতুময় পত্রতুল্য দ্রব্য : ধাতুর চাদর বা পাত ....
৮. তেজপত্র।"....[৪]

প্রাচীনকালে পুথি লেখা, পত্র রচনা করা হতো সাধারণত তালপাতা, তেরেট পাতা, ভূর্জপাতা, গাছের বাকল, সোনার পাত ও কাগজে। বোধ হয় প্রধানত পাতায় লেখা হতো বলে পুথির পাতা এবং লিপি রচনার পাতা উভয়ই পত্র নামে অভিহিত। আধেয়র (রচিত পত্র) নাম আধারের (পাতা) নামেই নামাঙ্কিত হয়ে এসেছে — পত্র বলে। পত্রেরই আরেক নাম চিঠি।

> "হিন্দি শব্দ চিট্‌ঠী। চিঠা ক্ষুদ্রার্থে চিঠি ; জমিদারী সংক্রান্ত হিসাবপত্র। "জমিদারী কাগজ কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা।"(টেকচাঁদ ঠাকুর)"[৫]

চিঠি শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত —

> "চিঠি কথাটা চিট বা চিরকুট কিংবা বিষয়কর্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, আর্জি বা নিবেদনের সঙ্গে হয়তো সংলগ্নতা ছিল আদিতে। চীর কথাটার অর্থ বস্ত্রখণ্ড বা বল্কল, এই সূত্রে সেটিও স্মর্তব্য। ... লিপি কথাটিও পত্রের প্রতিশব্দ ছিল সে যুগে, এর অন্বয় অবশ্যই খুঁজতে হয় না। দুটি শব্দেরই আদল সংস্কৃত, ভেতরে সৃজন বা শিল্পকর্মের আভাস আছে। শুষ্ক বৈষয়িকতা থেকে মুক্ত প্রাণবান একটা ব্যাপার। নথ্‌পুথু আনে ব্যাপ্তি, গৌরবে বহুবচন। তাই চিঠিপত্রই হোক আর চিঠি চাপাটিই হোক, তার মধ্যে একটা চলতি ব্যাপার আছে, আছে দফা-ক্রম ; সে বোঝায় পত্রাবলী।"[৬]

পত্র প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত — পত্রিকা[৭] (Epistle) ও চিঠি (Letter)।[৮] পত্রিকা এক ধরনের সাহিত্যিক রচনা যা কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও, সেই একজন উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এক শ্রোতৃবর্গের জন্যই তা লেখা হয়ে থাকে। তাই এই রকমের রচনায় সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও সুষমা সন্নিবিষ্ট হয়। পত্রিকা অনেকটা নাটকের স্বগত-ভাষণের মতো। এতে প্রায়ই প্রকাশিত হয় লেখকের অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক মনোভাব। পত্রিকা রচয়িতা অবশ্যই কবি-স্বভাবের হবেন। তাই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এ প্রকারের রচনায় অনুপস্থিত থাকলে চলে না। উদাহরণ হিসেবে শ্রী মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) কাব্যের পত্রিকাগুলি গ্রহণ করা যায়। চিঠি যেমন প্রেরক ও প্রাপকের যুগ্ম সৃষ্টি, পত্রিকা

তেমন নয়। পত্রিকায় রচয়িতারই একমাত্র ভূমিকা — পাঠক নীরব শ্রোতা মাত্র। তবে পাঠকের উদ্দেশ্যেই যে পত্রিকা রচিত হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে স্থানের ব্যবধানে থাকে দু'জন — পত্রদাতা আর পত্র গ্রহীতা। পত্রিকার মতো কাব্যিক ভাষায় পত্রদাতাকে পত্র রচনা করতে হয় না। তাই তাকে কবি না হলেও চলে। ভবিষ্যতে পত্র ছাপা হবে এবং পত্রদাতাকে এই ব্যাপারে আনন্দ দেবে এমন মনোভাব পত্র রচনার কালে তার মনে উদয় হয়না সাধারণত। পত্রদাতাকে গ্রহীতার মন বুঝে স্বতঃস্ফূর্ত পত্রালাপ করতে হয় — পায়ে পা মিলিয়ে চলার মতো। পত্র বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি হৃদয়ের একাত্মতার বা মিলনের পটভূমি রচিত হয়ে থাকে। 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা'র একান্ত ব্যক্তিগত কথোপকথন একমাত্র পত্রেই সম্ভব — যা আবার আড়ি পেতে শুনতে হয়। পত্রদাতা আর পত্রগ্রহীতার যৌথ ভূমিকা — অনেকটা যেন রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতার গায়ক ও শ্রোতার যৌথ ভূমিকার মতো —

> "একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিত হবে দুই জনে —
> গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
> তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে,
> বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে কলতান ফুটে।"[৯]

চিঠি মোটামুটি তিন প্রকারের। সমালোচকের ভাষায় —

> "এক, প্রয়োজনের মোদ্দা কথা, কাজের কথা, নিছক তথ্য এবং বক্তব্যসার্থী।
> দুই, ভাবনা-চিন্তা ও আস্বাদনমুখী বিবরণ-বিশ্লেষণ বর্ণনা প্রধান। যাকে বলা হয় সাহিত্য, পত্রসাহিত্য। আর পত্র যখনই সাহিত্য হয়ে ওঠে তখনই তা উদ্দিষ্টকে ছাপিয়ে পাঠক সাধারণের, সকলের। এই সকলের জন্য চিঠির প্রসঙ্গেই দেখা যাচ্ছে আর এক শ্রেণীর চিঠি — সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু চিঠি। যাকে বলা হয় খোলা চিঠি।" [১০]

খবরের কাগজে প্রকাশিত নানা বিষয়ের সমালোচনা বা জনসাধারণের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে খোলা চিঠির অবতারণা করে থাকে সাধারণ পাঠক। সাহিত্যে আবার বিভিন্ন ধরনের নামাঙ্কিত পত্রের উল্লেখ ও ব্যবহার দেখা যায়; যেমন, কপটপত্র (কবি-কঙ্কণ চণ্ডী), জয়পত্র (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), অজানা পত্র ('গোরা'— পৃঃ ৪৭),

বেনামা পত্র ('কপালকুণ্ডলা'– ৪ খ।৩ প.), ইস্তাহার পত্র ('দুই বোন'), ত্যাগ পত্র ('পোরা' – ৭৪.প.), নিমন্ত্রণ পত্র ('পোরা', ৪৪ প.) ; দানপত্র ('চোখের বালি' – ৭ প.), আদেশ পত্র ('বউঠাকুরাণীর হাট' – ৩৩ প.), সন্ধি পত্র ('রাজসিংহ' — ২৮ খ।১ প.), উইলপত্র (Will – 'কৃষ্ণকান্তের উইল') ইত্যাদি ।

প্রাচীন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ।[১১] কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল কিনা জানা যায় না । তবে অতি পুরাতন কাল থেকেই পত্রচর্চার ব্যাপারটা যে বিশেষ প্রচলিত ছিল, বররুচির "পত্রকৌমুদী" গ্রন্থ থেকে তা জানা যায় । পত্রের বিষয়বস্তু ছাড়াও পত্রদাতার নানা বিষয়ে নির্দেশ দান বা 'প্রশস্তি' পত্রের প্রধান বিষয় ছিল । জ্ঞানতাপস রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'পত্রকৌমুদী'র ভূমিকায় তিনি জানাচ্ছেন —

> "বররুচিকৃত 'পত্রকৌমুদী' নামক সংগ্রহই অধুনা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । তদ্দৃষ্টে স্পষ্টতই প্রতীত হয় যে, প্রশস্তি রচনা বিষয়ে তাঁহার পূর্বে হিন্দুদিগের বিশেষ মনোযোগ হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা বিশেষ উৎকর্ষও সাধন করিয়াছিল ।"

তাছাড়া এই গ্রন্থে পত্রের লক্ষণবৈশিষ্ট্যের পরিচয় তিনি ভূমিকায় রেখেছেন —

> "উক্ত গ্রন্থের মতানুসারে পত্রলেখনের অন্তর্মধ্যে ব্যক্তিভেদে পত্রের পরিমাণ, পত্রের ভাঁজ, পত্রের রঞ্জন, পত্রের কোণ কর্তন, পত্রে শ্লোকবিন্যাস, পত্রের পাঠ এবং শিরোনাম, এই কয় বিষয়ের উল্লেখ আছে ।"

পত্র রচনার এই সব প্রক্রিয়া-প্রযুক্তি পরবর্তীকালে বেশ শিথিল হলেও মধ্যযুগেও দেখা যায় বিশেষণযুক্ত গুরুগাম্ভীর্যপূর্ণ সম্বোধন ।[১২] পত্রের বিনিময় ও ব্যবহার যে প্রাচীনকালে হতো তার আরও প্রমাণ রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত পত্রে । কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ পত্রের ব্যবহার করেছেন । সাহিত্য সমাজের দর্পণ — সাহিত্যে পত্রের ব্যবহার সমাজ থেকেই গৃহীত বলা যায় । তবে রাজা বা রাজপুরুষদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকত । সাধারণ জন-সমাজ তখন তার বাইরে ছিল ।

মধ্যযুগে মুসলমান আমলেও পত্ররচনায় প্রাচীনযুগের ঐতিহ্য বেশ বজায় ছিল । এই যুগের পত্র নিতান্তই কেজো এবং সংবাদে পূর্ণ থাকত । বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত রচনায়

এ সংবাদও বেদনাদায়ক । ১১৭৬ বঙ্গাব্দ এবং তারপরে অন্নাভাব কী মর্মন্তুদ আকার ধারণ করেছিল এটি তার প্রমাণ ।"[১৪]

১৭৪৮ সালে পুত্র গুরুদাসের কাছে লেখা মহারাজা নন্দকুমারের একটি পত্রের কিছু অংশ —

" ... অদ্য চারিরোজ এথা পৌঁছিয়াছি । ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য । মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই । নাসাগ্রে প্রাণ হইল । ফলীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব .....।"[১৫]

অন্নাভাবে, নিরাপত্তার অভাবে জীবন বিপন্ন — এই উৎকণ্ঠিত অবস্থায় মহারাজের পত্রের অবতারণা । এই ধরণের পত্রের মধ্যে সাহিত্যের নাম-গন্ধও থাকার কথা নয় । এই যুগে গদ্যের ব্যবহার সাহিত্যে ছিল না — তবে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা গদ্যই ছিল । সাহিত্য সৃষ্টির বাহন ছিল পদ্য । তত্ত্ব– তথ্যমূলক সাহিত্যই হোক বা রসসাহিত্যই হোক সবই ছন্দে রচিত হত ।[১৬]

ব্রিটিশ তথা আধুনিক যুগে পত্র চলাচলের মাধ্যম ডাক ব্যবস্থা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হওয়ায় সাধারণ মানুষ এবং সাহিত্যিকদের পত্র রচনায় এবং আদান-প্রদানে গতির সঞ্চার হয় । ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশকে রাজা রামমোহন রায়* ব্রাহ্মসমাজ গঠন (১৮২৮) করেন । পত্র রচনার ইতিহাসে এই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার্য । সমালোচকের ভাষায় —"চিঠির সম্বোধন হিসাবে"শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, প্রিয়দর্শন প্রভৃতি পাঠ ব্রাহ্মরাই প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন ।" চিঠির ভাষা ভাবগম্ভীর হয়েও যে কতটা সুন্দর ও মিষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন ব্রাহ্মসমাজের নায়কদের লেখায় পাওয়া যায় ।"[১৭] এই শতকে রচিত কিছু পত্র, সাহিত্যিক শিরোপা পেয়ে পরবর্তীকালে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে ।

গদ্যভাষা — যুক্তির ভাষা ; আধুনিক যুগের জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যবহারিক ভাষা । এই ভাষাই এ যুগে মানুষের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে অন্দের আঁতের খবর পৌঁছে দিয়েছে কথা-সাহিত্যে । তাই দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে গদ্যের ব্যবহার না থাকায় কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয় নি । ব্যবহারিক গদ্যেই (সাধু ভাষা) প্রথম পত্র লেখা হয়েছে ।[১৮] এর পরবর্তীকালে খাঁটি চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ সাহিত্যে দেখা যায় চিঠি-পত্রে । তা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের রচনায় ; তাঁর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) গ্রন্থে । যদিও

*(১৭৭৪-১৮৩৩)

ইতিপূর্বে প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪ - ১৮৮৩) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে 'হুতোম প্যাঁচা' (১৮৪০ - ১৮৭০) চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনায় । তাঁদের ব্যবহৃত চলিত ভাষা ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং আঞ্চলিকতাদোষে দুষ্ট । সে যা হোক পত্রের আঙ্গিকে পদ্যে রচিত কথা-সাহিত্য তথা পত্রোপন্যাস আধুনিক যুগেরই ফসল ।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. "... কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সংগীতে এখনো তাহা করা যায় না। ... চিত্রে প্রকৃতির এক মুহূর্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। ... যে মুহূর্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত সেই মুহূর্তটি অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটিমাত্র স্থায়ীভাব বাছিয়া লওয়া, ভাবশৃঙ্খলের একটি-মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সংগীতের কাজ। ... কিন্তু কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্তের বাহ্য শ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া — জীবনের গতিস্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ... গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।"

দ্রষ্টব্য : সংগীত (সংগীত ও কবিতা), র.র.।১৪।৮৮৯-৮৯০

২. ভারতকোষ (৫ম খণ্ড) — সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ২২৫; পরেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য।

৩. ক) "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য।"

দ্র. সাহিত্য (সাহিত্যের সামগ্রী), র.র। ১৩।৭৪০

খ) "সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর — কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন।"

দ্র. সাহিত্য (বাংলা জাতীয় সাহিত্য), র.র.।১৩।৭৯৩

৪. বঙ্গীয় শব্দকোষ (১৯৬৬) — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সাহিত্য অকাদেমী

৫. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম খণ্ড (১৯৩৭), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

৬. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (১৩৪০ - ১৩৯০) — পুনশ্চ নিবেদন ইতি — আনন্দ বাগচী; পৃঃ ২৬৯

৭. ক) Epistle — A Selection, usually from an apostolic epistle, read in the communion service of the Greek, Roman and Anglican Churches.

Webster Dictionary - ' Encyclopedic, Ed- n

খ) পুরানো অর্থ — খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকের দ্বারা লিখিত — বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১৯৩৭) ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ।

৮. Epistles and Letters : A broad distinction exists between the letter and epistole. The letter is essentially a spontaneous, non literary production, personal and private, a substitute for spoken conversation. The epistole on the other hand rather takes the place of a public speech, it is written with an audience in view, it is a literary form, a distinctly artistic effort aiming at permanence."

Encyclopaedia Britannica (1957) 8 th, Vol. P: 660

৯. কাহিনী (গানভঙ্গ), র.র. ৯।৬৭৫

১০. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (১৩৪০ - ১৩৯০) — পুনশ্চ নিবেদন ইতি — আনন্দ বাগচী ; পৃঃ ২৬৯ ।

১১. "প্রাচীনকালেও ডাকের প্রচলন ছিল, তবে তখন কেবল সরকারি প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইত । বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোদোতাসের বিবরণে জানা যায়, প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্যের সরকারি ডাক ঘোড়ায় - চড়া ও পায়েচলা বাহকের (হরকরা) সাহায্যে দ্রুত গতিতে চলাচল করিত এবং নিয়মিত দূরত্বে তাহাদের বদলি করার ব্যবস্থাও ছিল । রোমক সাম্রাজ্যের ডাক - ব্যবস্থাও বেশ উন্নত ছিল ।"

দ্র. ভারতকোষ (৩য় খণ্ড) — সাহিত্য পরিষদ ; পৃঃ ৬৪০ ; যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বক্তব্য ।

১২. কোচবিহার রাজ নরনারায়ণ অহোমরাজ চুকাম্ ফা স্বর্গদেবকে লেখা (১৫৫৫ খ্রী:) চিঠির সম্বোধন : " স্বস্তি সকল - দিগদন্তি কর্ণতালাস্ফল সমীরণ প্রচলিত হিমকর - হার - হাস - কাশ - কৈলাস - প্রান্তর - যশোরাশি - বিরাজিত - ত্রিপিষ্ট ত্রিদশ তরঙ্গিণী - সলিল - নির্ম্মল - পবিত্র - কলেবর ভীমণ প্রচণ্ড ধীর - ধৈর্য্য - মর্য্যাদা - পারাবার সকল দিক - কামিনী - গীয়মান - গুণ সন্তান শ্রীশ্রী স্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রতাপেষু ।"

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (২ য় খণ্ড) — দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ; পৃঃ ১৬৭২ ।

১৩. পত্রটির একটু নমুনা :- "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি পরায়ত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অংকুরিত হইতে রহে ।"

প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (২য় খণ্ড) — দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ; পৃঃ ১৬৭২

১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৮৫), ৫ম খণ্ড, — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ৫৪

১৫. তদেব . পৃঃ ৪৮

১৬. "চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো গদ্যাত্মক গ্রন্থ, যাতে দার্শনিক চিন্তাই সর্বাধিক, তাও পয়ার — ত্রিপদীতেই রচিত হয়েছে । 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসও ছন্দে লেখা হয়েছে । এমন কি আয়ুর্বেদ গ্রন্থও বাংলা পয়ারের বন্ধন স্বীকার করেছিল ।"

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১৩৭৮) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৭০

১৭. বাংলার পত্রসাহিত্য (১৩৬৩) — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃঃ ৬

১৮. "বাংলা গদ্যের ব্যবহারযোগ্য রূপ সর্বপ্রথম চিঠি পত্রেই বিকশিত হয় ।"—
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৮৫) ; ৫ম খণ্ড — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ৩২

ভূমিকা : খ. পরিচ্ছেদ —

পত্র ও পত্রসাহিত্য ; দিনলিপি বা ডায়েরি ও পত্রসাহিত্য ; ডায়েরির আঙ্গিকে পত্রসাহিত্য ; প্রবন্ধসাহিত্য ও পত্রসাহিত্য ; পত্রসাহিত্যের লক্ষণ — পত্রদাতা ও পত্রগ্রহীতার সম্পর্ক — আলাপচারিতা ও কথোপকথন — স্মরণ — রসসৃজন — রচনা প্রকরণরীতি ; সাধারণ সাহিত্য ও পত্রসাহিত্য ; কথা-সাহিত্যের ধর্মবিবিক্ত কথা বা কাহিনী — ধর্মভিত্তিক উপদেশাত্মক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কথাসাহিত্যের অবদান ; কথাসাহিত্যের রূপ — হিতকথা ও রম্যকথা ; তাৎপর্যবাহী আধুনিক কথাসাহিত্য — ছোট গল্প ও উপন্যাস যা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে উদ্ভূত ; বঙ্কিমের রচনায় তার যথার্থ প্রথম পূর্ণরূপের বিকাশ ; কথাসাহিত্য ও পত্রসাহিত্য — বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে ; 'বিচিত্রতারদূত' কথাসাহিত্যিকের পত্রোপন্যাস সৃষ্টি ; উপন্যাসের সংজ্ঞা — শ্রেণীবিন্যাস — রূপকর্ম ও জীবনধারণা ; উপন্যাসের গঠনকৌশলে 'সর্বজ্ঞ' বা যথাকাহিক রচনারীতি — আত্মকথন রচনারীতি — তথ্যাগ্রয়ী প্রামাণিক বা পত্র রচনারীতি — এই সব আঙ্গিকের গুরুত্ব ও তার সমালোচনা; পত্রোপন্যাসের লক্ষণ বৈশিষ্ট্য — কাহিনী, চরিত্র, দৃষ্টিকোণ, স্থান বা পরিবেশ, কাল ও ভাষা ইত্যাদি ; প্রথম ইংরেজ পত্রোপন্যাসিক রিচার্ডসনের পত্রোপন্যাস সম্বন্ধে বক্তব্য ও মন্তব্য ; পূর্বোক্ত তিনটি রচনারীতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে পত্র রচনারীতির উপন্যাস বা পত্রোপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব ; পত্রোপ-ন্যাসের সীমাবদ্ধতা ; উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, স্থান বা পটভূমি, কাল, জীবনধারণা ইত্যাদি বিন্যাসে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহার ॥

বিভিন্ন ধরণের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য মুখ্যত পত্র রচিত হয়ে থাকে। বাস্তবে যা ঘটে চলেছে তারই বিস্তারিত যথাযথ চিত্র অঙ্কন যদি পত্রের উদ্দেশ্য হয় তবে তা ইতিহাস নামে অখ্যাত হবার যোগ্য। কিন্তু পত্র তা নয়। সাদা-মাঠা কেজো যে সব পত্র লেখা হয় তাতে প্রায়ই খবরাখবরের বস্তুভারই প্রাধান্য পায়। কিন্তু মানুষের মন যেমন সব সময় প্রয়োজনীয় কথার কারবারী হয়ে থাকতে পারে না — তেমনি 'বাজে কথা'রও সে রসিক খদ্দের, তাই অনেক সময়ই পত্রে পরিবেশিত বাস্তবের প্রেক্ষাপটে জগৎ ও জীবনের তথ্যগত সংবাদ, মনের আরকরসে জারিত হয়ে সাহিত্যের রূপ-রস পরিগ্রহ করে। তখন এই পত্রই, পত্রসাহিত্য পদবাচ্য হয়ে পড়ে — অনেকটা যেন পুঁথোপোকার নির্মোক পরিত্যাগে — বিচিত্র বর্ণদ্যুতিমণ্ডিত দৃষ্টিনন্দন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার মতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

> "... যাহাকিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। ....
>
> "... এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দুই ঠিক এক নহে।
>
> "... জীবনেরস্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে — তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে — সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে;" [২]

জীবনের স্মৃতিচারণা কোন্ প্রক্রিয়ায় রূপরসমণ্ডিত সাহিত্যে রূপান্তরিত হয় তা বলতে গিয়ে কবি সাহিত্য সৃষ্টির মৌল কথাটিই উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। মানুষের কাব্যিক মন রসের আধার বলে কখন কোন এক বিশেষ মুহূর্তে লৌকিক বিষয়ের খবর দিতে গিয়ে 'অলৌকিক মায়ার জগতের'র খবর ও পরিবেশন করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথের কথায় —

> "... বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে ; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই, মানুষের কাছে তাহার আদর আছে । .... তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য ।"[৩]

পত্র লেখকের মন বিষয়ভিত্তিক পত্র রচনায় প্রয়াসী, পত্র-রচনাকালে যদি সেই বিষয়ের উপলব্ধি, যথাযথ রূপায়ণ পত্রে মুখরিত করে পাঠকদের কাছে তা রসসঞ্চারী ও আদরণীয় করে তুলতে পারে — তবেই সেই পত্র সার্থক সাহিত্যগুণান্বিত পত্রের মর্যাদা পেতে সক্ষম । সাহিত্যপদবাচ্য চিঠির কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যে চিঠিতে ভর্তি মনের অবস্থায় জরুরী কথা ছাপিয়েও মুখরতা উদ্বৃত্ত থাকে — সেই চিঠিই প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য ।"[৪] তা না হলে পত্র সাধারণ সংবাদবাহী পত্রই থেকে যাবে । হয় তো তাতে জাতির সংস্কৃতি সভ্যতার পরিচয় থাকতে পারে কিন্তু তা সাহিত্য হয়ে উঠবে না । চিঠিতে লেখক আত্মপ্রকাশ করে, তাই সহজ ব্যক্তিমানুষটিকে চিঠিতে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না । পত্র-সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি —

> "মানবমনের দুটি আয়না — চোখ আর চিঠি । আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সবচেয়ে বেশি ধরা দেয় চোখের আলোয়, লেখকের অন্তরের কথা তেমনি সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ।'Style is the man' কথাটি পত্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে বোধ করি সবচেয়ে প্রযোজ্য । সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিটির মুখচ্ছবি আমরা চিঠিতেই প্রকাশ দেখি । বলা চলে'Letter is the man ."[৫]

পত্র-সাহিত্যের কথাবস্তু সাধারণত তুচ্ছ বিষয়াবলম্বী হয়ে থাকে । তুচ্ছ হলেও কিন্তু ফেলা-ফেলার নয় । সাধারণের মনোযোগে যা আকর্ষণীয় নয় — নিতান্তই সাদা-মাঠা এমন কিছুই পত্রে স্থান পেতে পারে । যেমন —'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু'।[৬] বলা বাহুল্য পত্র-সাহিত্য তুচ্ছ নগণ্যকেও মহনীয় করে তোলে । নিজের সঙ্গে আত্মগত আলাপ, সেই আলাপে নিজের মনকে তুষ্ট করার চেষ্টা, — তাই পত্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তু যা ঘোষণীয় নয় । আবার তথ্য জগতের সঙ্গে বিশেষ যোগ-জিজ্ঞাসা নেই, কেবলই আত্মজাগতিক কথায় যা ভরপুর তাও পত্রসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে

পারে না — সেটা নেহাতই দিনলিপি বা ডায়েরি গোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দিনলিপি আর পত্রসাহিত্যের পার্থক্য নির্দেশে — সমালোচকের মন্তব্য —

"... রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাব, তাঁর স্বধর্ম। আসলে আত্মসমীক্ষা ও আত্ম-উন্মোচনই ওই-সব পত্রে কবির অভিষ্ট। ব্যক্তিগতভাবে পত্র প্রাপক সেখানে অনেক খানি অপ্রধান। .... হয়তো 'ভারহীন সহজের রস', কবি যাকে চিঠির যথার্থ রস বলেছেন, তখন তত্টা নেই, তবু আত্মমগ্ন মনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা — উপলব্ধির কথাই শেষ পর্বের পত্রগুচ্ছেও পাই। ... কোন কোন চিঠিতে দিনলিপির অন্তরঙ্গ আত্মমগ্ন মুরটি স্পষ্ট। ...'মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠির তেতলার নিভৃত ঘরটি —আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে — পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূর দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল।' — ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এর ভিতরকার যে nostalgic অনুভূতির নিড়ানি, তা বিশেষভাবে দিনলিপির রস-সংবেদনকেই জাগিয়ে তোলে। .... বস্তুত কবির শেষ পর্বের এই ধরণের রচনায় চিঠির চেয়ে ডায়েরির অন্তর্নিহিত স্বভাবই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।"[৭]

প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীর কিছু চিঠিও দিনলিপির ঢং-এ লেখা। (১৭ থেকে ২৩ শে অক্টোবর, ১৮৯৪, প্রতিদিন কিংবা ২৩-২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৪ সনের প্রতিদিন)। এই পত্রগুলিতে পত্রগ্রহীতার কাছ থেকে উত্তর প্রাপ্তির আশা না করেই পত্রদাতা আপন মনে পত্র রচনা করে চলেছেন, যেন নিজের সঙ্গে নিজের আলাপন। এগুলি দিনলিপিধর্মী চিঠি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। ডায়েরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত —

"ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগোতে চায় না, আগলাতে চায়। ... প্রহরীর কাজ আমার নয়; আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ভুলে যাবার অধিকার দিয়েছেন।" [৮]

কবির 'শিলাইদহ থেকে লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১১ই মার্চ, ১৮৯৫ তারিখের ২০ সংখ্যক

NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR
102651
22 NOV 1989

চিঠিখানাই এই বিষয়ে কবির 'পরোক্ষ স্বীকৃতি' বলে ধরে নেওয়া যায় ।

যা হোক, একজনকে উদ্দেশ্য করেই পত্র রচিত হয়ে থাকলেও পত্রে সেই ব্যক্তিরই অনুপস্থিতিতে, — তখন তা আর পত্র-বাচক রচনা থাকে না, সর্বসাধারণের প্রতিবাচ্য হয়ে প্রবন্ধে রূপান্তরিত হয় । প্রবন্ধের বিষয় তথ্য ও তত্ত্বাশ্রয়ী । অন্য দিকে, পত্রের বিষয় তথ্যাশ্রয়ী — এখানে অবশ্য উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থেকে যায় । তবু ছদ্মবেশী প্রবন্ধ অনেক সময় পত্র-সাহিত্যের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে নিজের গোত্র পরিবর্তনের চেষ্টায় থাকে । রবীন্দ্রনাথের শেষ দুই দশকের জীবনকালের অনেক পত্র এই ধরণের । পত্রসাহিত্য বিশেষভাবে ব্যক্তিনির্ভর । পছন্দ-অপছন্দ এবং ঘটনাপ্রবাহ তার পায়ে পায়ে পোষা বিড়ালের মতো চলবে । এতে তথ্যের পরিক্রমণের সঙ্গে থাকবে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় । পত্রের কৌতূহল আর কৌতুকরসের প্রস্রবণ পাঠকের মনকে রসসিক্ত করে তুলবে । নির্মল হাস্যরস মনকে প্রসাদগুণে ভরিয়ে দেবে । পত্রসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ —'আলাপের দ্বৈতরূপ' । পত্র লেখার সময় সম্পর্ক ও উদ্দেশ্য অনুসারী এক এক পাত্রের কাছে লেখক এক এক ভাবে পত্র রচনা করে থাকেন । সেই পত্রে লেখকের বিভিন্ন ধরণের মনের চিত্ররূপ ধরা পড়ে । পত্রের দাতা ও গ্রহীতা মনের দিক থেকে হবেন রাজযোটক 'যেন হাঁড়ির মত সরা' । অনেক সময় প্রবল ব্যক্তিত্বশালী পত্র লেখকও ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে পত্রগ্রহীতার নমনীয় ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি এসে পড়েন ।[৯]

শোনা যায় জার্মান কবিকুলপ্রদীপ গ্যাটে হাজার দশেকের বেশি পত্র রচনা করেছিলেন ।[১০] কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথও অজস্র পত্র রচনা করেছেন, যার সামান্য কিছু প্রকাশিত । সেই সব পত্রে যেমন বিষয়-বৈচিত্রের ছড়াছড়ি তেমনি গঠনকৌশলের চমৎকারিত্ব । অন্যান্য সাহিত্যশাখার মত পত্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিম এবং অনন্য । তাঁর সংখ্যাতীত পত্র থেকে পত্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক এবং এদের বিষয়ে যেসব মতামত ও বক্তব্য কবি প্রকাশ করেছেন তা পর পর উদ্ধৃতির সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে । – প্রথমতঃ দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক —

ক) "... যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তারও একটি চিঠি লেখাবার

ক্ষমতা আছে । .... তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয় । .... সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে । সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারিনে — কেবল গল্প-গুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাশা নয় । বায়রণ মুরকে যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রনের স্বভাব প্রকাশ পায়নি, মুরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে — সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায়রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি মুরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে । যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়।" [১১]

খ) "... বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই — এই চার পৃষ্ঠার চিঠি মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সেই জায়গায় কখনো পৌঁছাতে পারে না ।" [১২]

দ্বিতীয়ত : আলাপচারিতা ও কথোপকথন —

ক) "মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বরযোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না, সেই উত্তাপে দেখতে দেখতে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে ; .... এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চা হয় সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও ।" [১৩]

খ) "চিঠিপত্র দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই তা নয়, তার মধ্যে আরও একটু রস আছে — ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই । .... সামান্য কথাবার্তা এবং আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা পড়ে একটা নতুন চেহারা বার করে — কথায় যে জিনিসটা এড়িয়ে যায় .... চিঠিতে সেইটেই অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয় ।" [১৪]

তৃতীয়ত: স্বরূপ —

ক) "চিঠি জিনিসটা ছোট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতীলতার মতো বড়ো।"[১৫]

খ) "পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠি-খানি কম জিনিস নয়। পোস্ট আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখবৃদ্ধি হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। .... কিন্তু চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ... আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি মোহ আছে, লেফাফাটি চিঠির একটা প্রধান অঙ্গ — ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।"[১৬]

চতুর্থত: রসসৃজন —

"যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখে, আলাপ করে যায় — তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। ... ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। .... কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়। ... যে মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে মানুষ হাসে, আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল — চারি দিকের যে-কোনো কিছুতেই তার মনটা একটুমাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশি হয় — গাছের মর্মরধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।"[১৭]

পঞ্চমত: রচনা প্রকরণরীতি —

"যদি না মনে করো আমি অহংকার করছি তা হলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সে হাল্কা চাল অনেক দিন থেকে চলে গেছে — এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই — দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প।"[১৮]

এখানে শুধু রবীন্দ্র পত্র-সাহিত্য-কেন্দ্রিক আলোচনা করা গেল। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যপদবাচ্য পত্র আর কেউই বাংলা সাহিত্যে রচনা করেননি — তা পত্রের সংখ্যার বহুত্বের দিক থেকেই হোক বা বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, বৈচিত্র্য ইত্যাদির দিক থেকেই হোক। তাছাড়া পত্রসাহিত্যের নানা দিক যেমন, পত্রসাহিত্যের সংজ্ঞা, লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনাও তাতে রয়েছে। প্রাক্-রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যিকগণ অনেকেই পত্র রচনা করেছেন ঠিকই এবং পরবর্তীকালেরও অনেকে — কিন্তু বিনয় নম্র চিত্তে বলা যায়, তাঁরা কেউ পত্রসাহিত্য রচনার কোন দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন।

সাধারণ সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি সেই সাহিত্য যা সব দেশের সব ধরণের মানুষের সাহিত্য রস-পিপাসার তৃপ্তি দান করে — বিশেষ কোন পাঠকশ্রেণীর জন্য তা রচিত নয়। সাধারণ সাহিত্যে দেখা যায়, বিষয়বস্তুতে ভাবরসের গভীরতা, ব্যাপ্তি, ও বৈচিত্র্য; গঠনকৌশলের সহজ সরল প্রকরণ; জীবনের আদর্শগত দিকের প্রসার, জাগতিক জীবনের ভাল-মন্দ চাওয়া-পাওয়ার প্রতি আকর্ষণ এবং পাঠকের আশা-আকাঙ্খার চরিতার্থতা ইত্যাদি। লেখকের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের ছাপ সাধারণ সাহিত্যে থাকলেও — ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে যাওয়াই এই ধরণের সাহিত্যের বিশেষত্ব। সাধারণ সাহিত্যের ধর্ম এই —

> "উহা পাঠকের সুপ্ত কল্পনাকে জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিপূর্ণ আত্মাকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' মন্ত্রে দীক্ষিত করে। তাই উহা কেবল ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও সতর্ক করে না, কল্পনাকে বিমোহিত করে না, অনুভূতিকে দ্রবীভূত করে না, বা ভাবনা চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে না — আমাদের সর্বাঙ্গীণ মানব সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে।"[১৯]

সাধারণ সাহিত্য ও পত্র সাহিত্যের পার্থক্যের কথা 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন —

> "... সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের, আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধি । সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূরদেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে । আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছ-ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার ঘূর্ণি, আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সম্মোরণথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ ।" [২০]

রবীন্দ্রনাথের রচিত পত্রে সাধারণ সাহিত্যের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয় । জীবনের মধ্যসীমা অতিক্রম করার আগে পর্যন্ত তাঁর লেখা চিঠিপত্র, পত্রসাহিত্যের রসাস্বাদবাহী । শরতের মেঘের মতো লঘুপক্ষচারিতায়, আন্তরিকতায় প্রসাদগুণে তাঁর এই সময়কার যথার্থ পত্রসাহিত্য । তখনও কবি বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হন নি । পাঠককুলের কথা ভেবে কবি কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচল অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে হাল্কাচালে খোলামেলা ভাবে মুখের কথা বলার ঢং-এ মনের কথা কলকলনাদিনী প্রবহমানা পার্বত্য নদীর চলার কায়দায় পত্রগুলি লিখে গেছেন । পত্রের সূতিকাগার যে পত্রলেখক ও গ্রাহকের মন — তা বোঝা যায় তাদের মনের নিভৃতই ভাবের আদান প্রদানে গড়ে ওঠা যথার্থ পত্রসাহিত্য । অন্যদিকে পঞ্চাশ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ —'পৃথিবীর কবি' । সচেতন মন নিয়ে তখন তাঁর পত্র রচনা । যে কোন পত্র ছাপার অাঁচড়ে পাঠকের দরবারে যখন তখন আবির্ভূত হতে পারে । তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ পত্রসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে উজাড় করে উপহার দিতে পারেন না, তার পরিবর্তে নিজেকে উপস্থিত করান 'কবি, দার্শনিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, ভ্রাম্যমাণ যাত্রী কিংবা উপদেষ্টা' হিসেবে । এই সব পত্র তখন কবিত্বে, দার্শনিকতায় কৌতুকরসে সাধারণ সাহিত্য রূপেই গণ্য হয় — পত্র-সাহিত্য হিসেবে নয় ।

কথার পৃষ্ঠে কথা সাজিয়ে কথার মালা গেঁথে সাহিত্যিক উপহার দেন কথা-সাহিত্য । কথাই সাহিত্য সৃষ্টির মালমসলা । এই মাল-মসলার দ্বারাই যখন তৈরী হয় লাবণ্যযুক্ত রসময়ী বাক্-প্রতিমা — তখনই লেখকের সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয় । শব্দ ও অর্থের মূলধন নিয়েই কথা-সাহিত্যে রসসৃষ্টির কারবার করে থাকেন কথাসাহিত্যিক । অর্থবহ শব্দের দ্বারা লেখক প্রকাশ করেন ভাব — সেই ভাব পাঠকের সাহিত্য পাঠের পরিশীলিত মনের ভাবকে

উদ্‌জীবিত করে তার রস-পরিণতি ঘটায় । তাই দেখা যাচ্ছে —'শব্দার্থময় কথাবস্তুর দ্বারাই লেখককে রসের অমরাবতীতে পৌঁছাতে হয় । [১০ক] কথাবস্তু যদি 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী' হয়ে পাঠকের মনে লেখকের ইপ্সিতমতো রসের যোগান দিতে সক্ষম হয় তবেই তা যথার্থ সাহিত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে ।

কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা । এদের মধ্যে যে শাখাকে আশ্রয় করলে রসসৃষ্টিতে লেখকের সবচেয়ে বেশি সফলতা — লেখক তাকে গ্রহণ করেই সাহিত্য সৃজন করে থাকেন । কবির সৃষ্টি কাব্য, নাট্যকারের নাটক, প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ এবং কথাসাহিত্যিকের গল্প ও উপন্যাস । বলাই বাহুল্য ছোটগল্প ও উপন্যাসকে কথাসাহিত্য বলা হয় ।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে নানা সমালোচক নানান কথা বললেও সবাই কিন্তু একটা বিষয়ে একমত — সেটা হলো, কথাসাহিত্য গদ্যে রচিত জাগতিক-পরিবেশে মানব জীবনকেন্দ্রিক শৈল্পিক কাহিনী । গল্প কথায়, মানবহৃদয়ের চলচ্চিত্র ; — মানব চরিত্রের প্রকাশই কথাসাহিত্যের উপজীব্য বিষয় । আবার কথা সাহিত্যের 'কথা' বা 'কাহিনী' মানব-জীবনভিত্তিক — তাই 'কথা' শব্দটি আধুনিক কালে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ।

ক্রম-পরিবর্তনের ধারায় কথা-সাহিত্যের 'কথা' শব্দের আনুপূর্বিক একটা পরিচয় নেয়া যেতে পারে । ড: সুকুমার সেনের ভাষায় —

> "... সংস্কৃতে শব্দটি (কথা) বিশেষ্য, অর্থ — আখ্যান, গল্প, প্রসঙ্গ, বাক্যালাপ, বিবরণ ইত্যাদি । ... বিশেষ্যরূপ হইতে নামধাতুও গঠিত হইয়াছে — কথয়তি (গল্প বলা, বলিয়া যাওয়া — অর্থাৎ দীর্ঘ ভাষণ অর্থে) । ....
>
> "কথা শব্দটি বিশেষ্যরূপে গৃহীত হইবার ... একটি কারণ হইল গান অর্থে 'গাথা' শব্দের প্রচুর ব্যবহার । যাহা গান করা হয় তাহা 'গাথা', অতএব যাহা গল্প করা যায় তাহা কথা । .....
>
> "কথা শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার কালিদাসের আগে পাই নাই । মেঘদূতে

কালিদাস অবন্তি দেশের প্রসঙ্গে সেখানকার উদয়ন – কথাকোবিদ 'গ্রামবৃদ্ধ'দের উল্লেখ করিয়াছেন । ...

"লৌকিক কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, গল্প — এই সব অর্থে পূর্বে ... প্রচলিত ছিল — আখ্যান ও আখ্যায়িকা । ...

" 'কথা' শব্দ গৃহীত হইবার আগেই 'আখ্যান' অপ্রচলিত হইয়াছিল । 'আখ্যায়িকা' ছিল, ... । ... কথা ছিল কল্পিত কাহিনী, আর আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক অথবা পুরাগত কাহিনী । ....

"আখ্যান, আখ্যায়িকা' শব্দের উপসর্গযুক্ত ধাতু 'আ + খ্যা' হইতে শাব্দভাবী 'কথ্' ধাতু, যাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'বলা' 'কথা কওয়া' । যেমন 'কথানিকা' (ছোট গল্প অর্থে) শব্দ প্রাকৃতে 'কহানিআ', হিন্দী 'কহানী' বাঙলায় 'কাহিনী' ।"[২১]

এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, কথা, আখ্যান, আখ্যায়িকা, গল্প, কাহিনী ইত্যাদি নামে সংস্কৃত কথা-সাহিত্য ধারার প্রচলন ছিল । বলা যায় কথা-সাহিত্যের উৎস বেদের আখ্যানসূক্ত । উদাহরণ — পুরূরবা-উর্বশীসংবাদ । ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ধর্মভিত্তিক হলেও, কথা-সাহিত্যের কিন্তু ধর্ম ব্যতিরিক্ত অবদান । বৌদ্ধ জাতক ও অবদান সাহিত্য নামে পালিভাষায় গল্প রচিত হয়েছে । প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত জৈন শাস্ত্র-সাহিত্যও ধর্মপ্রসারের জন্য রচিত হয়েছিল — কথা সাহিত্যের উপাদান এদের মধ্যেও রয়েছে । সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু পুরাণ-ইতিহাসেও কথা-সাহিত্যের অবদান দেখা যায়, যদিও এদের রচনার নেপথ্যে রয়েছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য । তাই কথাসাহিত্যের আনন্দের পরিক্তি ভোজে এদের তেমন ঠাঁই মেলা ভার ।

প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের, " .... যে রূপগুলি আজ লোক সমাজে প্রচলিত, তাদের স্পষ্টত: দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : হিতকথা ও রম্যকথা । আচার্য কীথ এদের নাম দিয়েছেন Fable ও Tale । তিনি মনে করেন, নীতি শিক্ষার দিক থেকেই Fable-এর অবদান, আর Tale-এর অবদান রসকথার দিক থেকে । কিন্তু কথাসাহিত্যে এ দুটি উপাদান এমনভাবে মিশে আছে যে

একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব । ...

"Fable বা হিতকথার ... প্রথম সংস্কৃত সঙ্কলন বহুখ্যাত 'পঞ্চতন্ত্র'। ... খুব সম্ভব এই ধরণের (রম্য) কথার আদি কথক গুণাঢ্য ।... ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গুণাঢ্যের পরিচয় আজও বহন করছে ।" [২২] তবে আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যের সঙ্গে এদের আসমান-জমিন ফারাক ।

প্রাচীন-যুগের সংস্কৃত - পালি - প্রাকৃত - অপভ্রংশ সাহিত্যের 'কথা' বা কাহিনী ধর্মভিত্তিক বা উপদেশাত্মক ।প্রত্যক্ষভাবে মানবজীবন-কেন্দ্রিক নয়, কিন্তু আধুনিক যুগের 'কথা' বা কাহিনী গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ জীবনানুভবকে কেন্দ্র করে । অন্যান্য শাখার সাহিত্যেও কথা বা কাহিনী আছে তবুও উপন্যাস ও ছোট গল্পকেই বিশেষ করে কথাসাহিত্য বলে চিহ্নিত করা হয় এই জন্য যে, কথা-সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে সাধারণ গল্পের মতো ঘটনার শুধুই বিবরণ দেন না । তিনি ঘটনা-পারম্পর্য এবং সম্ভাব্যতা রক্ষা করে রহস্যের ইঙ্গিতবাহী বিবরণ দিয়ে থাকেন। তাই সাহিত্যিককে হতে হয় সুগভীর জীবনবোধের অধিকারী এবং জগৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । এখানেই 'কথা'-সাহিত্য আধুনিক-যুগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আমাদের মনে হতে পারে বাংলা কথাসাহিত্য সংস্কৃত-প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষাসাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী হয়েই বুঝি আধুনিক কথাসাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে — আসলে তা কিন্তু নয় । "ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে সব নূতন ধরণের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম ।" [২৩] যথার্থ ছোটগল্পও উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছে — তাই 'নূতন ধরণের সাহিত্য' বলতে এখানে ছোটগল্পকেও উল্লেখ করা যায় এবং এই দু'য়ে মিলেই বাংলা কথাসাহিত্য ।

ঊনিশ শতকে বাঙালীর মন ইউরোপীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সাহচর্যে এসে আধুনিক যুগচেতনার বশবর্তী হওয়ায় বাঙালীর সাহিত্য আর জীবন পরস্পর প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে । ফলে জীবনে আসে চাঞ্চল্য, পরিবেশ সচেতনতা, সুবৃহৎ তাৎপর্য, গদ্য ভাষায় আসে যুক্তি, চিন্তা ও মনন । বাঙালী উদ্বুদ্ধ হয় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে। তখনই বাংলা সাহিত্য তথা কথাসাহিত্য আধুনিক তাৎপর্যবহ হয়ে উঠতে সুরু করে । এই

সমযুকার বাঙালীর মোটামুটি সর্বাঙ্গীণ বাস্তব অবস্থা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

"... এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্ত-প্রতীক-রূপে।...

"... য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল ... সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। ...

"যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। ....

"... য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সর্বভৌমিকতা; আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোন চির প্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। ....

"... য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে দিয়েছে।"[২৪]

'এই আত্ম-সম্মানের গৌরববোধেই' বাঙালীর কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। তবুও কথা-সাহিত্যকে গদ্য ভাষার প্রতিবন্ধকতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রাক্- বঙ্কিমযুগের বাংলা কথাসাহিত্য এবং বাংলা ভাষার শোচনীয় দৈন্য অবস্থার যথার্থ চিত্ররূপ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে —

"... তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না।

> তাঁর পূর্বকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। ... বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্যরূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্তা ছিল। বাংলা ভাষায় কথা-সাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলা সাহিত্যে।" [২৫]

দেখা যাচ্ছে আধুনিক যুগের বাংলা কথাসাহিত্যের জন্ম ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে হলেও পূর্ণরূপ পেয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে — বঙ্কিম-রবীন্দ্রের স্বর্ণ লেখনীতে।

কথাসাহিত্য ও পত্রসাহিত্যের মধ্যে মূলগত প্রভেদ, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক—উভয় দিক থেকে। প্রথমেই বলতে হয় কথাসাহিত্য রচিত হয় জগৎ ও জীবনের গোপনীয় ও ঘোষণীয় কাহিনী ও চরিত্রের টানা-পোড়েনে। অন্যপক্ষে পত্রসাহিত্যে কাহিনী বড় একটা নেই বললেই হয়। "চিঠি পত্র কথোপকথন ও রীতিমত প্রবন্ধের মাঝামাঝি একটা জিনিস।" [২৬] আবার বলা হয়েছে, "চিঠির বিষয়টা অত্যন্ত তুচ্ছ; পত্রসাহিত্য তুচ্ছ বিষয় প্রধান অবলম্বন অবহেলার বস্তু নয়; বস্তুত পত্রসাহিত্য তুচ্ছ বিষয়ের রাজ-সিংহাসন।" [২৭] কথাসাহিত্যে বিভিন্ন রসের সর্বজনীন রচনা — পত্র-সাহিত্য ব্যক্তিনির্ভর রচনা, মনের কথা এবং 'সহজরসে'ই যেন এর সার্থকতা। তবে এর মধ্যে দার্শনিক মনোভাবের ছিটেফোঁটা থাকলে তা তেমন দূষণীয় হয়ে ওঠে না। শিল্পগত দিক ক্ষুণ্ণ করে এমন তথ্যের ভার, দার্শনিক চিন্তা ভাবনা একেবারেই যে কথাসাহিত্যে থাকে না তা কিন্তু নয় — সেটা প্রযুক্ত হয় অত্যন্ত সচেতনভাবে অনেকটা যেন "কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"। [২৭ক] পত্রসাহিত্য তথ্যপ্রধান এবং বিনোদনই একমাত্র উপলক্ষ। 'ভারহীন' হাল্কা চালে' রচিত বলে হাসি-তামাসা কৌতুক ও নির্মল হাস্যরস প্রায়ই তাতে মেলে। কথাসাহিত্য রচিত হয় ছাপার অক্ষরে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার জন্য — কিন্তু পত্রসাহিত্য সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয় না — তবে বিখ্যাত ব্যক্তির রচনা হলে, পরবর্তীকালে ছাপা হতেও পারে এই মনোভাব হয়তো লেখক পোষণ করে থাকেন। পত্র-সাহিত্যে চলমান জগৎ ও জীবনের ঘটমান প্রবাহের প্রতিফলন, অতীতের ঘটে যাওয়া বিষয় হয়তো প্রসঙ্গত আলোচিত হয়। কথাসাহিত্যে কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক

রূপায়ণ প্রধানত হয় না — সময়সাপেক্ষে, কল্পনার তুলি বুলিয়ে গ্রহণ বর্জন, লেখকের ভালোলাগা মন্দলাগার মিশ্রণে তা রচিত হয় । কথাসাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক রচনা । লেখক নেপথ্যচারী — তাঁর রচনায় নিজের আত্মপ্রকাশ নৈব নৈব চ । আবার পত্রসাহিত্যে, লেখক নিজেই পত্রের প্রধান চরিত্র ও ব্যাখ্যাকার । গ্রহীতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটানোই তার কাজ ।

পাঠকের মনোরঞ্জন তথা তার মনে রসসঞ্চার করা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আনন্দলাভ — লেখকের নেপথ্যের দ্বৈত প্রেরণা । সাহিত্যিক 'বিচিত্রতার দূত'। কত ধরণের আনন্দসঞ্চারী রচনাই তাঁর লেখনীপ্রসূত । উপন্যাসের বিষয়বস্তু (content) এবং পত্রের কাঠামো নির্ভর গঠনকৌশল (form) সমন্বয়ে পত্রোপন্যাস কথাসাহিত্যিকের অপূর্ব সৃষ্টি । উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে থাকে নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ — গঠনকৌশলেও কত ধরণের রকমফের । নিজ নিজ পত্রের সহায়তায় পত্রোপন্যাসের চরিত্রাবলী, উপন্যাসের কাহিনীর (প্লট) বিস্তার ও চরিত্রের বিকাশ ঘটায় । পত্রের আঙ্গিকে উপন্যাস রচনার নেপথ্যে রয়েছে প্রধানত উপন্যাসিকের গতানুগতিক উপন্যাস কাঠামোয় নতুনত্ব আনার প্রচেষ্টা এবং পাঠকমনে চমক দেবার প্রয়াস । এ ছাড়া উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্যই পত্রোপন্যাসে বর্তমান থাকে ।

বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সমালোচক ও উপন্যাসিক, উপন্যাসের নানা প্রকারের সংজ্ঞা নির্ণয় এবং উপন্যাস সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন ।[২৮] আসলে উপন্যাসের এই ধরণের সংজ্ঞা একপেশে । উপন্যাসের স্বরূপ, লক্ষণ ইত্যাদি যে যেমন বুঝেছেন তিনি তেমন সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজে নিজের বোধকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন মাত্র — তাই এই সংজ্ঞা সর্বাঙ্গীন না হয়ে আংশিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত । তবে বলা যায়, উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয় একটা কঠিন কাজ । এবং সম্ভব বলেও মনে হয় না । উপন্যাসের শুধু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকভিত্তিক সংজ্ঞা, শ্রেণী বিন্যাস বা বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে স্থান পেতে পারেনা — যদি পায়ও তা হলে উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ অনন্ত হয়ে দাঁড়াবে । এই জন্য যে, উপন্যাসের বিষয়গত ও রূপগত দিক প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল । এবার একটু বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক্ । নিম্নে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র

উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাস প্রদত্ত হল —[২৯]

ক) রোমান্স শ্রেণীভুক্ত — দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম ।

খ) রোমান্সের আতিশয্য — চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম ।

গ) প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস — রাজসিংহ ।

ঘ) সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস — ইন্দিরা, রজনী, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল ।

এই উপন্যাসগুলি কত বিচিত্রমুখী এবং বিপুল প্রসারী — উপন্যাসের সাধারণ সংজ্ঞায় এদের সীমাচিহ্নিত করণের কাজটা বেশ একটু শক্ত । বোঝা যাচ্ছে এই শ্রেণীবিভাগ উপন্যাসের কথাবস্তুভিত্তিক হয়েছে । কিন্তু আঙ্গিকগত রচনাশৈলীতে 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' কত স্বতন্ত্র । পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও দেখা যায় বিষয়গত ও রূপগত কত বৈচিত্র্য । তবে মোটামুটি যে উপন্যাসের সার্বিক সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত বহাল তা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় —

> "উপন্যাস সামাজিক মানুষের আখ্যান-ভিত্তিক জীবন কাহিনীর মাধ্যমে তার চরিত্র বিকাশ ও জীবন তাৎপর্যের পরিস্ফুটন ।"[৩০]

দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ে জটিলতা থাকলেও এইটুকু সাধারণত বলা যায় যে, উপন্যাসের দু'টো দিক — শরীর ও আত্মা । উপন্যাসের কায়া — নির্মিতিতে রূপদক্ষ ঔপন্যাসিক অনুসরণ করেন মহাকাব্যের বর্ণনারীতি, প্রবন্ধের বিশ্লেষণের ধরণ, নাটকের ঘটনা-বিন্যাস ও গতি (Action)এবং জীবনচরিতের আত্মকথনরীতি । তাছাড়া সাধারণ উপকরণ হিসেবে তিনি গ্রহণ করে থাকেন বিশেষ করে কাহিনী, চরিত্র ও ভাষারীতি । তবে বলা যায় মানুষ নানা মানসিকতার অধিকারী, তাই তার শিল্পকলার প্রকাশরীতিও বিভিন্ন —"Style is the man himself"- সেই দিক থেকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ তাঁরই সম্পূর্ণ নিজস্ব । তাঁর উপন্যাসের রূপকর্ম ও জীবনদর্শন প্রকাশকালে তিনি যে রসসৃজন করেন — তাই হল উপন্যাসের আত্মা । গদ্যোপন্যাসে প্রাগুক্ত সব লক্ষণেরই সমাবেশ ঘটে থাকে, তবে তার সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজিত হয় গদ্য-রচনারীতি ।

উপন্যাস রচনায় প্রধানত তিন ধরণের রীতি প্রযুক্ত হয় — ক) প্রত্যক্ষ বর্ণনাধর্মী বা মহাকাব্যিক বা 'সর্বজ্ঞ' (omniscient) রচনারীতি (খ) আত্মকথন রচনা-রীতি, (গ) পত্র রচনারীতি বা তথ্যাশ্রয়ী প্রামাণিক রচনারীতি । উপর্যুক্ত রচনা-রীতির একাধিক মিশ্রণেও উপন্যাস লেখা হয়েছে । এবার এই তিন ধরণের উপন্যাস রচনারীতির পর পর পরিচয় নেয়া যেতে পারে ।

প্রথম শ্রেণীর পদ্ধতিতে উপন্যাসিকের ভূমিকা অনেকটাই সদা-সর্বদা দর্শন ও শ্রবণরত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো । লেখক সহজ সরল স্পষ্ট সহজবোধ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে 'প্রথম পুরুষে' স্ব-ইচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে উপন্যাস রচনা করেন । মহাকাব্যের কবি জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত সর্বসাধারণের কাহিনী গ্রহণে 'সরলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা এবং ঋজুতা' অবলম্বন করে বস্তুপ্রধান ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টি করে থাকেন । উপরন্তু তিনি জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলার জন্য বিশেষরূপে, মহাকাব্যের 'ধীর গম্ভীর প্রশান্ত সমুন্নত ও মহত্ত্বব্যঞ্জক' ভাব প্রকাশ করেন । আবার নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনীর নাটকীয়তা ও গতি (action) সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র গড়ে তোলেন । উপন্যাসিক খানিকটা মহাকবি ও নাট্যকারের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করে বরণীয় ভূমিকা পালন করেন ।সমালোচকের ভাষায় —

> " ... কতকটা নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে গোটা জীবনকে .... দেখার এই রীতিটি মহাকবির — উচ্চাঙ্গের নাট্যকারের । কাহিনীর সর্বত্র লেখকের এই দৃষ্টি সম্প্রসারিত । যেন তিনি একটু উপর থেকে আলো ফেলে জীবনের গোটা মঞ্চকেই আলোকিত করে তুলতে চান । একটু দূর থেকে হলেও তাঁর মমত্ব সর্বব্যাপী কিন্তু উচ্ছ্বসিত আসক্তিতে লিপ্ত নয় ।" [৩১]

বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা" ও "রজনী" ব্যতীত আর তাঁর সব উপন্যাসই উপরিউক্ত রীতিতে রচিত । আত্মকথন রচনারীতির উপন্যাস সৃষ্ট হয় উত্তমপুরুষের বিবৃতিতে । সরসতা, সজীবতা ও বাস্তবতা — আত্মকথনমূলক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য । উপন্যাসিক নিজে, নায়ক বা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, নিজের মনের কথা, ঘটনার বিস্তার ও বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশ ও পরস্পর সম্পর্ক ইত্যাদি বর্ণনা করেন ।

অনেক সময় লেখক একটি অপ্রধান চরিত্রে 'আমি' এই সর্বনামের আড়ালে থেকে নায়ক-নায়িকার সব ধরনের কার্যাবলী ও জীবনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিজের উক্তিতে দিয়ে থাকেন । আবার কখনো কখনো নায়ক নায়িকাসহ উপন্যাসের প্রতিটি প্রধান চরিত্র নিজ নিজ কথা আত্মকথায় পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করে । তাদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের নানা দিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । এই দুই ধরনের মিশ্র রীতির উপন্যাস, Dickens-এর "David Copperfield," শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', 'স্বামী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' । 'রজনী' গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' আত্মকথন — রচনারীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —

> "উপাখ্যানের অংশবিশেষ নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা ..... এই প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায় ।"[৩২]

এই ধরনের রচনারীতির সার্থকতা সেইখানে যখন ঔপন্যাসিক তাঁর প্রত্যেকটি সৃজিত চরিত্রের ব্যবহৃত মুখের ভাষার সঙ্গে মিল রেখে তাদের স্বভাব ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন ।

তথ্যাপ্রয়ী প্রামাণিক বা পত্ররচনারীতির উপন্যাস লেখা হয় চিঠিপত্র ও ডায়েরি লেখার রীতিতে । উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের লেখা পত্রের বর্ণনা ও বিবৃতির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । ঔপন্যাসিক বিশেষ কৌশলে নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য প্রধান বা অপ্রধান চরিত্রের লেখা পত্র ও ডায়েরি অথবা শুধুই পত্রের মাধ্যমে উপন্যাস নির্মাণ করে থাকেন । চরিত্রগুলি নিজের লেখা চিঠিতে শুধু নিজের কথাই বলে না — উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র বা ঘটনার বিন্যাসও করে থাকে । চিঠিপত্র ও ডায়েরির বিষয় অত্যন্ত গোপনীয় দলিলের মতো । এগুলির মধ্যে মানুষ একান্তভাবে শুধু নিজের জন্যই বা একান্ত আপন জনের জন্য নানা কথাবস্তু লিখে রাখে । তাই চিঠিপত্রে, ডায়েরিতে নিজের উক্তির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের চরিত্রগুলির গোপন সত্তার উন্মোচন ঘটে । পত্রাকারে উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য —

> "কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যদি চিঠি-পত্র বা ডায়েরীর গোপনতায়

> আত্মকথন করে উপন্যাসোপম বিরাট বিবৃতির রূপ গ্রহণ করে, সেখানে উপন্যাস নিঃসন্দেহে কল্পনা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অবশ্যই পরীক্ষামূলক হতে বাধ্য। প্রত্যক্ষ তথ্য ও সত্য এ জাতীয় উপন্যাস বর্ণনায় ঘটনা ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।" [৩০]

এই যে উপন্যাসের তিন প্রকারের রচনারীতির কথা আলোচনা করা গেল, একটু খোলা মনে এই আলোচিত বিভাজনের কথা ভাবলে, আমাদের চোখ পড়া স্বাভাবিক যে, উপন্যাসের রচনারীতির এই প্রকারের শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার তেমন গুরুত্ব নেই। এই জন্য নেই যে, ঔপন্যাসিক যা লেখেন তা নিজের জীবনচর্যা এবং জীবন-অভিজ্ঞতার বিবরণ, কিন্তু কল্পনামিশ্রিত হয়ে নানা রূপ-রস রীতিতে তা প্রকাশ হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে লেখা এক একটি বই-এ লেখকের উপলব্ধি, অনুভব ও জীবনচেতনা প্রকাশের হয়ে ওঠে। তাঁর লেখা বই-এর মধ্যে, তাঁর এই নিজের প্রকাশ করার প্রবণতা সব সময়েই অনায়াসে কাজ করে যায়। তাই যখন তিনি প্রথম পুরুষ বর্ণনধর্মী উপন্যাস লেখেন, তখনও ঔপন্যাসিক নিজের সত্তার বৈশিষ্ট্যকে লুকিয়ে রাখতে অপারগ হন। নিজে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসে উপস্থিত থাকতে পারেন না — এভাবেই লেখাই উপন্যাসের শিল্পরীতির দিক থেকে শ্রেয় বটে, কিন্তু অন্তরাল থেকে জীবনদৃষ্টির নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা গ্রহণ করেন — উপন্যাসের নায়কের মাধ্যমে। আত্মকথনমূলক উপন্যাস তো লেখকের জীবনের অংশ হয়ে যায়। আত্মকথন-রীতির উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যতটা পাঠকদের কাছে ধরা দেন অন্য কোন রীতিতে ততটা ধরা দেন না। পত্রোপন্যাসে — চিঠিতে, আত্মকথার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক লেখকই ধরা পড়েন পাঠকের কাছে — তবে বিশেষ করে এই রীতির উপন্যাসে মানব জীবনের "আত্মার সঙ্গে গোপন সংলাপের — সৌন্দর্য খুঁজবার গান"এর ইতিহাসই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। তাই উচিত বলে মনে হয় — সব প্রকারের রচনা-রীতির উপন্যাস - গুলিতেই ঔপন্যাসিক আত্মদর্শন করে থাকেন মাত্র।

পত্রোপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য আগেই প্রধানত ইংরেজী কথাসাহিত্য প্রভাবিত হয়। প্রথম ইংরেজী উপন্যাস "পামেলা" (১৭৪০) রচনা করেন স্যামুয়েল রিচার্ডসন। এটি একটি পত্রোপন্যাস।[১৪] পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যে আরো অনেক পত্রোপন্যাস লেখা হয়েছে (তাদের পরিচিতি সর্বশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)।

রিচার্ডসনের পত্রোপন্যাসে শিল্পীমনের পরিচয় আছে । তিনি সচেতন উপন্যাস লেখক না হলেও প্রথম উপন্যাস এবং তারো দুটিতে ('ক্লারিসা' ও 'স্যার চার্লস গ্র্যান্ডিসন') উপন্যাসের সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি বিষয় — জীবনদর্শন, প্লট, চরিত্র, দৃষ্টিকোণ, স্থান বা পশ্চাৎপট, কাল, ভাষা ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপন্যাসে সমাবেশ ঘটিয়েছেন । এই কলাকৌশলটি তিনি তাঁর উপন্যাসে নানাভাবে সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন এবং আলোচকের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ মন্তব্য করেছেন । বিশেষ করে উপন্যাস রচনায় তাঁর পত্ররীতির (Epistolary Method) পদ্ধতি গ্রহণ সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত এবং উপন্যাস রচনায় পত্ররীতির সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তিনি যে পত্রোপন্যাসের রীতি প্রবর্তন করলেন পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকগণ তাঁর অনুসৃত পথেই পত্রোপন্যাস রচনা করেছেন — তবে জীবনদর্শনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটালেও গঠনবৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনে তেমন কেউ-কেউ চিন্তা করেননি ।

এবার পত্রোপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রিচার্ডসনের ধারণার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে । প্রথমেই ধরা যাক কাহিনী বা প্লটের (Plot)-এর কথায় । প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো ঔপন্যাসিক রিচার্ডসন কাহিনী (story) ও প্লট-এর মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না — তাই তাঁর কাছে কাহিনী ও প্লট সমার্থক ।[৩৪] নিজের রচিত 'ক্লারিসা' (১৭৪৭-৪৮) পত্রোপন্যাসের পুনশ্চ-কথনে (Post-Script) রিচার্ডসন কাহিনী সম্পর্কে বলেছেন —

> "A story in which so many persons were concerned either principally or collaterally and of characters and dispositions so various, carried on with tolerable connection and perspicuity, in a series of letters from different persons without the aid of digressions and episodes foreign to the principal design, the thought had novelty to be pleaded for it ."[৩৫]

অর্থাৎ একটি কাহিনীতে বহু চরিত্র এসে জড়ো হবে — কেউ কেউ মূল কাহিনীর অংশী থেকে, কেউ কেউ বা মূল কাহিনীর পাশাপাশি খেলাধুলা করে — নানা প্রকৃতির চরিত্রের সংখ্যাধিক্য, তাদের চরিত্রের নানা রকম গুরুত্বও এসেছে। উপন্যাসের কাহিনী কিন্তু তাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সামূহিক ভাবে গতিশীল — বিশেষ করে এই কাহিনী যখন কেবলমাত্র চিঠিপত্রের মাধ্যমেই উপস্থাপিত হচ্ছে, কোন উপকাহিনী জুড়ে বা কোন অপ্রাসঙ্গিক কল্পকথার অবতারণা ছাড়াই — যা কিনা মূল কাহিনীকে দুর্বল করতে পারে — এই যে নতুনভাবে কাহিনী উপস্থাপন এটি একটি অনন্য এবং নিঃসন্দেহে এই উপস্থাপনা-প্রকরণ রিচার্ডসনের একটা বিশিষ্ট দাবী রাখে।

রিচার্ডসনের এই উক্তি থেকে জানা গেল, তাঁর রচিত পত্রোপন্যাসে প্রধান বা অপ্রধান চরিত্রগুলি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বা পাশাপাশি অবস্থান করেও, কাহিনীর ধারাকে সমান অক্ষুণ্ণ রেখেছে, মূল কাহিনীকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোন উপকাহিনীর অবতারণা ব্যতিরেকে ঔপন্যাসিক একেবারে নতুন কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন, যা অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যের নজির রেখেছে। এখানে কাহিনী ও চরিত্র সমান তালে তাল না রেখে উপন্যাসের পরিণতিতে একসূত্রে মিশেছে। উপন্যাসের চরিত্রসম্পর্কে রিচার্ডসনের বক্তব্য—

> "But whatever were the fate of his work, the author was resolved to take a different method. He always thought that sudden conversions, such especilly as were left to the candour of the reader to suppose and make out, had neither art, nor nature, nor even probability, in them and they were moreover of very bad example ..... The characters are various and natural; well distinguished and uniformly supposed and maintained." [১৮]

অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের দৃঢ় সংকল্প, তাঁর লেখা সমাদর লাভ করুক বা না করুক তিনি নতুন

প্রকরণের মাধ্যমেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ঘাটিত করে থাকেন । তাঁর মত সমগ্রেই মনে হতো ; কাহিনী বা চরিত্রের হঠাৎ যে রূপান্তর সেটা মেনে নেওয়া কেবলমাত্র সম্ভব সরলমতি পাঠক-পাঠিকার দ্বারা । কিন্তু এই ধরণ কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রবিশ্লেষণ শিল্প তো নয়ই স্বাভাবিক নয় এমন কি বিশ্বাসযোগ্যও নয় । বরঞ্চ এই ধরনের প্রক্রিয়া, অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপাদান । ... চরিত্রগুলি বিভিন্ন ধরনের অথচ তারা স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত, খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সর্বত্র অনুকরণীয় ।

চরিত্রসৃষ্টি ও কাহিনী বয়নে ঔপন্যাসিক রিচার্ডসন চরিত্র ও কাহিনী-ধারার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিকত্বের ধারায় থেকে ক্রমবর্ধমান দৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন, হঠাৎ হঠাৎ কাহিনী ও চরিত্রের অস্বাভাবিক পরিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না — যার দ্বারা অতিনাটকীয়তা প্রকাশ পেতে পারে । এই ধরনের প্রক্রিয়াকে তিনি নিকৃষ্ট শিল্পকৌশল বলে মনে করতেন । গতিশীল লোকচরিত্রের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি — তাঁর চরিত্র-সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেছে ।

উপন্যাস রচনায় রিচার্ডসনের দৃষ্টিতে অন্যান্য রীতির চেয়ে পত্রলেখন পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল । এই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য —

> "All the letters are written while the hearts of the writers must be supposed to be wholly engaged in their subjects (the events at the time generally dubious); so that they abound not only in critical situations , but what many be called instantaneous description and reflections". [৩৮]

অর্থাৎ সমস্ত চিঠিগুলি লেখা হয়েছে তখন, যখন পত্রলেখকেরা সম্পূর্ণভাবে মগ্ন তাদের বিষয়ে (ঘটনার পরম্পরা সেই মুহূর্তে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই অস্পষ্ট) । এই জন্যই চিঠিগুলিতে পাওয়া যায় অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক বর্ণনা ।

উপন্যাস রচনায় দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক পত্রনিবন্ধরীতি নির্ধারণে সার্থক অগ্রণী, এ. যখন তিনি পত্রলেখকের আত্মমগ্ন ভাব তুলিতে তুলতে সচেষ্ট হন — তুলনা

শুধু বিশ্লেষণে চিন্তা-ভাবনার প্রত্যক্ষ বিবরণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে — দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থা উদ্ঘাটিত হতে বাধা থাকে না । শকুন্তলার চরিত্রের আত্মপ্রকাশে বিশেষ সজীব, সতেজ ও কুলপ্রবাহী হয়ে উঠে যদিও আবেগ উচ্ছ্বাসের অতিরেক দেখা যায় না । শকুন্তলার নিজের কথা বর্ণনা করলেও, তাঁর লেখকটি নৈর্ব্যক্তিক থাকতে হয় ।

বিভূতিভূষণ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে প্রাকৃতিক ও পারিবারিক নানা দিকের বর্ণনা দিয়েছেন, তবে বাস্তব বাস্তবিকভাবে বিভিন্ন আশেপাশের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এবং প্রবাসের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় । এই দিক থেকে তাঁর উপন্যাসে পরিস্থিতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

মধুসূদনের বিভূতিভূষণের সম্পর্কে বলা যায় যখন তিনি মন্তব্য করেন —

> "Much more lively and affecting must be the style of those who writes in the height of a present distress, the mind tortured by the pangs of un-certainly (the events then hidden in the womb of fate) than the dry , narrative unanimated style of person relating difficulties and danger surrounded ....." (১)

অর্থাৎ এই রাজনৈতিক চরিত্রে অনেক বেশি সর্বজ্ঞানী এবং অনেক বেশি সজীব, এইসব শকুন্তলার লেখা যারা পড়বেন বিশ্বাস হয়, বর্তমান ঘটনার বিস্তৃত দেখতে দৃষ্টি হয়, পাঠের মন অনিশ্চয়তার বিপরীত দিকে দিয়ে (ঘটনা পরিণাম তখন সেই দুর্ভেদ্য বিন্দু ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকে) । এই রাজনৈতিক ঘুমন্ত অতীত সম্পর্কে আত্মকথাগুলি অনেক বিস্তীর্ণ, দুঃখ, বেদনা সকলের দুঃখ-দুর্দশা সবই অতীত হয়ে থেকে । ....

চলমান ঘটনা বর্ণনা, তার মধ্য দিয়ে চরিত্র উদ্ঘাটনের যে কৌশল ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেন, তার দিকে দিয়েই উপন্যাসের 'অলৌকিক মানুষ-জগত'র মূল-প্রেরণা

ক্রম — এ থেকেই পাঠকের মনে আগ্রহ, কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। ঘটে পারম্পর্য রহিত বিষয়ের বর্ণনা পাঠে যেমন করে পাঠকের মন উৎসুক হয়ে ওঠে না।

উপন্যাসের রচনারীতি ও ভাষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের মতামত জানা গেলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ও সমগ্র সম্বন্ধে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। ঘটনা ও চরিত্রের সুসংহত ভাবুকতা, ও গতিশীলতা; সর্বজ্ঞপ্তিতা, সজীবতা, বাস্তবানুগতা, সুস্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণ বোধগম্য ঔপন্যাসিকদের রচনারীতির ... বৈশিষ্ট্য — তথা কালের রচনারীতি তাঁর কালে ছিল অনেক নির্ভীক ও দৃঢ়।

ঔপন্যাসিক ভিক্টোরিয়ান উপন্যাস রচনায় তাঁর জীবনদর্শন এবং জীবনের সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর মতামত —

> "In this general depravity when ever the pulpit has lost great part of its weight and the clergy are considered as a body of interested men, the author thought he should be able to answer to his own heart, be the success what it would if he threw in his mite towards introducing a reformation so much wanted and he imagined that if in an age given up to diversion and entertainment, he could steal in, as may be said and investigate the great doctrines of christiani-ty under the fashionable guise of an amusement, he should be most likely to serve his purpose remembring that of the poet :-
>
> A verse may find him who a sermon flies,
> And turn delight into a sacrifice."[30]

অর্থাৎ চারিদিকে নীতিবোধ শিথিল, নারীর উপন্যাসাবলীর মূল্য অনেক কমে গেছে, পুরোহিতশ্রেণীকে দেখা যায় স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণী হিসাবে। দূষিত বাতাবরণ যখন এই রকম তখন লেখক মনে করলেন তিনি তাঁর চরিত্রের মূল্যবোধের উন্নতি ঘটাবেন, সে উন্নতি অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, যদি তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ সংস্কারের জন্য প্রয়োগ করেন। তিনি জানতেন এই ঘটিতব্য দুঃখ সবাই যখন চতুর্দিকে জনমনের সম্ভাবী, তিনি দুঃখানলে নিজেকে দগ্ধ করতে পারবেন কেবলমাত্র চরিত্রের মুখোশ পরেই। এই ভাবেই বস্তুতঃ তিনি তাঁর মুক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবতাকে এগোতে পারবেন — এক কবি যেমন বলেছেন —

অনেকগুলি বাঁশী বাজাতে যাও খেলাতে যাও
লোকে তখনই এত যায় ছুটে পালাবে —
কিন্তু কবিতার আবহাওয়া যদি বদলাতে পারো
আনন্দে আত্মনিবর্তন নিয়েও কথা প্রস্তুত।

উপন্যাসের প্রাগুক্ত রচনারীতির তিনটির মধ্যে অনেক সমালোচক সর্বশেষেরটি অর্থাৎ পত্ররীতি সবচেয়ে উৎকৃষ্টের বলে মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রথম বর্ণনাধর্মী উপন্যাসে লেখক উপন্যাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে না পড়ুন বরং তাঁর যে বর্ণনা-পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন তাতে চরিত্রগুলির মোটেই অন্তরঙ্গতার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে না। আবার আত্মকথনমূলক রীতির উপন্যাসে লেখক নিজে এক নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উত্তমপুরুষে ঘটনা-চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনা ও বিভাব বিশ্লেষণ করে যান — তাতে এক-ঘেয়েমির অবকাশ থাকে — পাঠকদের মনে হতে পারে লেখক যেন তাঁর অতীত জীবনের এক বিরাট কাহিনীই লিখিয়ে চলেছেন — তার মধ্যে সাক্ষীভূতা, চমক বা বাস্তবতার স্থান যতই থাক না কেন। অথচ এই ধরনের উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন চরিত্র পৃথক পৃথক ভাবে আত্মকথাই উত্তমপুরুষে বলে থাকে — তাতে ঘটনার বিকাশ ও চরিত্রের বিবর্তনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই রচনারীতিতে নায়ক আত্মকথা বলে উত্তমপুরুষে, ঘটনার বিবরণও দেয়; আবার অন্যান্য চরিত্রগুলিরও স্বাধীন মতামত ফুটিয়ে তোলে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের কথা তার বাচিত হয় না অন্যূনী রচনার

অর্থাৎ চারিদিকে নীতিবোধ শিথিল, তাদের উপন্যাসগুলির পুরুষ অনেক বদলে গেছে, পুরোহিততন্ত্রীকে দেখা যায় স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণী হিসেবে। সুতরাং বাতাবরণ যখন এই রকম তখন লেখক মনে করলেন তিনি তাঁর অন্তরের প্রশ্নাবলীর উত্তর পাবেন, সে উত্তর অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, যদি তিনি তাঁর অবশ্য শক্তি অবাধ্য সংস্কারের জন্য প্রয়োগ করেন। তিনি জানতেন এই অতিপক্ক সুখ স্বর্গই যখন চতুর্দিক আনন্দের আধারী, তিনি স্বপ্নালোক নিদারুণ প্রবেশ করতে পারবেন কেবলমাত্র চতুর্দিকের সুযোগ পরেই। এই ভাবেই হয়তো তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা দেখাতে পারবেন — এক কবি যেমন বলেছেন —

> জ্ঞানশাস্ত্র রাখি শোনাতে যায় শোনাতে যাও
> লোকে তবুও এক যায় ফুটে পালাবে —
> কিন্তু কবিতার অবকাশে যদি বলতে পারো
> অবশ্য আত্মবিস্মৃতি দিয়েও তারা শুনছে।

উপন্যাসের প্রকৃত রচনারীতির তিনটির মধ্যে অনেক সমালোচক সর্বশেষরীতি অর্থাৎ নাট্যরীতি অবজেক্টিভ উপন্যাসের বলে মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রথম বর্ণনাত্মক উপন্যাসে লেখক উপন্যাসের মধ্যে সরাসরিভাবে জড়িত থাকে না পড়ুক সকল তাঁর যে বর্ণনা-পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন তাতে চরিত্রবর্ণনা অনেকটাই তাৎক্ষণিকতার পরিচয়ে নিবিড় হয়ে ওঠে না। আবার আত্মকথনমূলক রীতির উপন্যাসে লেখক নিজে এক নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উত্তমপুরুষে ঘটনা-চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে যান — তাতে এক-দেশদর্শিতার অবকাশ থাকে — পাঠকদের মনে হতে পারে লেখক যেন তাঁর অতীত জীবনের এক বিরাট ইতিহাস লিখছেন — তার মধ্যে সত্যনিষ্ঠতা, চমক বা বাস্তবতার উপাদান যতই থাক না কেন। আবার এই ধরনের উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন চরিত্র পৃথক পৃথক ভাবে আত্মকথাই উত্তমপুরুষে বলে যায় — তাতে ঘটনার বিকাশ ও চরিত্রের বিবর্তনও পরিচয় পাওয়া যায়। পত্র রচনারীতিতে মাধ্যম আত্মকথা বলে উত্তমপুরুষে, ঘটনার বিবরণও দেয়; আবার অন্যান্য চরিত্রগুলিরও প্রসঙ্গে সম্বন্ধও ফুটিয়ে তোলে। উপন্যাসের অন্যান্য অঙ্গের কথা তার রচিত পত্র বা আবেগ রচনায়

মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হলেও সেই সব চরিত্র কিছু কিছু পত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে আত্মকথন-যুক্ত থাকে — এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের কথোপকথনের প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের 'গ্রন্থন' গড়ে ওঠে। আত্মকথনরীতিতে এই ব্যাপারটা ছাড়া আর সবটাই প্রায় পত্রোপন্যাসের মতো সাদৃশ্যমূলক। আবার আত্মকথন-রীতির উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সুযোগ থাকে না নায়ক অথবা লেখকের। তিনি স্বয়ং উপন্যাসে উপস্থিত হয়ে উত্তমপুরুষে বক্তব্য প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, ঘটে যাওয়া ঘটনা যতক্ষণ না অতীতের গর্ভে চলে যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি কোন মন্তব্যও রাখেন। বিপুলা পৃথিবীর চলমান প্রবাহ উপন্যাসের নায়কের অজানা — তাই তার অবস্থানবিন্দুতে যথাযথভাবে তা বিবৃত করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু পত্রোপন্যাসের প্রধান প্রধান প্রতিটি চরিত্র, তার স্বভাবধর্মের মতো লেখেন আত্মবিবরণী দিয়ে থাকে। ফলে রচনারীতির দিক থেকে পত্রোপন্যাস ক্রমমুখে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।[৪১] চিঠিতে চিঠিতে উত্তর-প্রত্যুত্তর থাকায় নাটকীয়তার রূপও প্রস্ফুটিত হয়। আত্মকথনরীতির সঙ্গে পত্ররীতির উপন্যাসের প্রধান পার্থক্য— কথক চরিত্র একসময় নিজের কথা বলে যায় বা বলে বলে যান — কিন্তু কাহিনীর শেষ পরিণতি সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল থাকে। এই শেষ পরিণতি জেনে যাওয়ার ফলে অতীতের বিশ্লেষণ প্রভাবিত হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। পত্ররীতিতে এমনটি হবার নয় — পত্র লেখা চলতে থাকে কাহিনীও অগ্রসর হয় এবং শেষ পত্রটি লেখার পরে কাহিনীর যবনিকা পড়ে — তাই আগে থেকে শেষ পরিণতি জানা থাকে না বলে এই রীতির কথক-চরিত্র কোন ঘটনা বা চরিত্রের দ্বারা তার চিঠি লেখার সময় প্রভাবিত হয় না। এই রীতির এই বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

পত্র-রচনারীতির উপন্যাস অন্যান্য রচনারীতির উপন্যাসের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সরল।[৪২] সাধারণ কথাবস্তু এবং সাধারণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে পত্ররীতির সাহায্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি করা যায়, সুন্দর ও সফল উপন্যাস রচনা করা যায় রিচার্ডসন তা দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

পত্রোপন্যাসে পত্র লেখক বা লেখিকা যে উদ্দেশ্য নিয়ে পত্র রচনা করছে, ভবিষ্যৎ না জেনে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে যে সব ঘটনার তাৎক্ষণিক বিবরণ দিচ্ছে, সেই বর্ণনা তার সেই সময়কার ব্যক্তিগত উপলব্ধিসঞ্জাত। সেই তাৎক্ষণিক অনুভবের নিখুঁত

বাস্তব প্রতিবাস্তি যা যখন যেমন ঘটে চলেছে এবং মনের অন্তর্গত সক্রিয় ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, পত্র রচনার মধ্যে তার যথার্থ রূপায়ণ। এই দেশের পাত্র-পাত্রী পত্র রচনায় বিশেষ সুবিধা পেয়ে যায়। এই ব্যাপারে উপলব্ধি যে মানুষ ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করছে, — লেখক উপন্যাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে অনুপস্থিত থেকে সেই সব যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া মানুষ ব্যক্তিত্ব তাদের ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগা এবং বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ উপলব্ধিকে নিজের ইচ্ছামতো প্রকাশ করতে পারে বলে, পাত্রপাত্রীর মনের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হবার সুযোগ পায়। তবে উপন্যাসের বাস্তবতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে না। পত্রোপন্যাস পড়ে, পাত্রের মানুষ ও চিন্তাধারার রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের পত্র পাঠ করার পর পরিষ্কার বিবেচিত অবকাশে পাঠক চিন্তা এবং কল্পনার সুযোগ পায়, দুটি পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর ধরে সেই সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ে প্রতিপক্ষের পত্রের উত্তর পড়ে নিজের ভাবনাচিন্তা মিলিয়ে নেবার মধ্যে পাঠক সন্তুষ্টির ব্যাপার ঘটে। এই অবকাশ একমাত্র পত্রোপন্যাসের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। পত্র মানস-দর্পণ স্বরূপ — নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করার অবকাশ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর রয়েছে।

অভিনয় দেখে আমরা আনন্দ পাই — জীবনের বাস্তব প্রতিরূপ নাটকের পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হয় বলে। তবু কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা নাটকের পাত্র পাত্রীর আসল রূপ (ব্যক্তিগত রূপ) সম্বন্ধে জানার আগ্রহে গ্রীনরুমে (Green room) হানা দিয়ে থাকি। উপন্যাস পড়ে পাঠক যে রস পায় — তাতে সে সব সময় সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে লেখকের এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কতটা অধিকার ও আগ্রহ তা জানার জন্য ঔপন্যাসিকের কাছে উপস্থিত হবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। লেখক নিজেই তাঁর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় উজাড় করে ঢেলে দিয়ে থাকেন কিন্তু তবুও পাঠক তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে লেখক সম্বন্ধে বাড়তি কিছু জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে — তাতে উপন্যাস পাঠের তৃপ্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় —

> কোনো মহামনা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তেই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত এক করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, তাহা নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে,

উদ্ঘাটন এবং পত্র কবিতা জীবন এবং কালের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।"[৪৩]

ঔপন্যাসিক পাঠককে এই বিষয়ে নিযুক্ত করার জন্য এমন অত্যুৎসুক হয়ে নিজেকে তাঁর রচনার মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেন — যাতে পাঠক বুঝতে পারে — সেই রচনা কৃত্রিমতার বাদ-বর্জিত – যা সত্য বা বাস্তব তারই প্রতিলিপি । এই বাস্তবের আত্মপ্রকাশ লেখার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্মতায় লেখক পাঠক-মনকে পরিচয় দিতে পারলেই উপন্যাসের সেই 'Illusion of Reality'-র পরিচয় পাঠক পেতে পারে এবং পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে ওঠে, অনায়াসে কাহিনীতে পাঠকের মনে দৃঢ়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় । তাই লেখককে অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা পালনে বাধ্য হতে হয় । লেখকের আত্মগোপন, তাতে তাঁর বাস্তবতানিষ্ঠতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । প্রথম অধ্যায়, পৌর্বিক দিক-ও প্রসঙ্গ তার প্রকাশ করতে হয় লেখককে । তাই লেখক অনেকটাই পাঠকের সঙ্গে উপন্যাস পাঠের পরিধিতে পরিধিতে বিচরণ করেন ।

পত্ররচনা-রীতির সীমাবদ্ধতার কথায় এবার আসা যাক —

ক) উত্তম পুরুষে চিঠি বা আত্মজীবনী লেখার সময়, লেখক নিজে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলে সব সময় অন্যান্য চরিত্রের নানা দিক এবং উপন্যাসের অন্যান্য ঘটনা সার্বিকভাবে চিত্রিত করতে পারাটা তার পক্ষে সহজ নাও হয়ে উঠতে পারে । বিশেষ করে অন্যান্য চরিত্রের গোপন মনের নিগূঢ় বিষয়ের দিকগুলি সাবলীলভাবে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ।

খ) অন্যান্য ধরণের উপন্যাসে লেখক যেমন সূত্রধারের ভূমিকা গ্রহণ করেন, পত্রোপন্যাসে লেখকের সেই সুযোগ নেই — যেমন নেই নাটকে নাট্যকারের। এ ধরণের উপন্যাসে গোপনীয়তা বলে কোন কথা না থাকায়, লেখক [illegible] হয়ে ওঠেন বর্ণনা ও বিবৃতিতে — চরিত্র প্রকাশে, তাতে করে পুনরুক্তি দোষ দেখা যায় — নির্লিপ্ততার প্রকাশ ঘটে, অত্যুক্তির প্রকাশ হয় তার ঔচিত্যবোধ রক্ষা করার কোন দায় থাকে না লেখকের ।

গ) চিঠি লিখে লিখে, চিঠি লেখার বাহিকপ্রবণতায় লেখককে একবার পেয়ে বসলে উপন্যাসের দিক থেকে তা অবাস্তব বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক । তখন উপন্যাস-পাঠে পাঠকের চোখ থেকে বাস্তবের আচ্ছাদন খুলে যায় । বাস্তবতার দিক থেকে পত্র-

লেখককে দীর্ঘ পথ ও দুর্গম মধ্যপথ চিঠি লেখা শেষ করা প্রয়োজন ।

২) বিভিন্ন চরিত্রের পত্ররচনায় পত্রলেখকদের ভাষার বৈচিত্র্য যদি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ককারী না হয় তবে ঔপন্যাসিক পত্ররীতি ব্যবহারে যে ব্যর্থ তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

৩) পত্রোপন্যাস তথ্যবাদী পত্রে সর্বদাই সত্যপ্রায় — যেখানে আবেগোচ্ছ্বাস বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি বিষয় চরিত্রের বিশ্লেষণ ইত্যাদি পাঠকের মনে এমন ভাব সৃষ্টি করে, যা অনেক সময়ই বিরক্তির কারণ । আবার তার সাথে যদি অপ্রাসঙ্গিক বাগাড়ম্বর এসে জোটে তবে তো সোনায়-সোহাগা ।

৪) নাটকে বা চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োজন সুপ্রযুক্ত না হলে তা যেমন ভার-বাহী হয়ে পড়ে এবং সংলাপনায় নাটক বা চলচ্চিত্রের গতিকে ব্যাহত করে, তেমনি পত্রো-পন্যাসেও চরিত্রের উপযোগী বা বিষয়ানুবর্তিত ভাষা ব্যবহৃত না হয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাস-বহুল অথবা পুনরুক্তির প্রবণতা ভাষার প্রয়োগ ঘটে তবে উপন্যাসের গতি প্রতি পদক্ষেপে ব্যাহত হতে বাধ্য ।

৫) পত্রধর্মী পদ্ধতির দুর্বলতা প্রসঙ্গে বহু আগেই চেখভের ভাষায় —

"as a literary form it is no good in many respects ; it puts the author into a frame, — that is its main weak-ness " [২২]

পূর্বের উপন্যাসে দৃষ্টিকোণ, কাহিনী, স্থান, কাল, চরিত্র, জীবন-ধারণা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে । কাহিনীর জটিলতা সৃজনে, যোগাযোগ রক্ষায়, ক্রমবিকাশের নিরূপণ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে পত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । পটভূমি ও পরিবেশ উপস্থাপনে বাস্তবানুগামিতা এবং সময়ের নির্দেশনায় বাস্তবের প্রতীতিতে পত্রের ভূমিকা তেমনি জরুরী । চরিত্রের, শ্রেণীর ও বিভিন্ন জটিল মানসিক দিকের উন্মোচনে, বিশ্লেষণে, অপ্রকাশিত গোপন গূঢ় 'মনের কথা' উদ্‌ঘাটনে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহার অনস্বীকার্য । পত্রকৌশলে

অকল্পিত বাস্তবতা সৃষ্টির প্রয়োজনে, বাস্তবের আভাস সৃজনে (Illusion of reality) এবং নানাভাবে চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন পরিস্ফুটনে পত্রের বিশিষ্ট ভূমিকাও একান্তই স্বতন্ত্র। একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে সব সময়ই ঔপন্যাসিকদের মনে রাখতে হয়। উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার পাত্র-পাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই করতে হবে — বাস্তব সংসারে মানুষ যেমন প্রয়োজনে পত্রের আদান-প্রদান করে থাকে, তেমনি উপন্যাসে পত্র লেখার প্রয়োজনের তাগিদ, কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদির দিক থেকে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তা যেন কখনোই আরোপিত ব্যবহার না হয়ে দাঁড়ায়।

গল্প শোনা বা পড়া মানুষের আদিম অভ্যাস। এই অভ্যাসের জন্যই সে বিশেষভাবে গল্পের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এই আকর্ষণের খানিকটা তৃপ্তি ঘটে কথা-সাহিত্য পাঠে। তাই গল্প বা উপন্যাস যা-ই পাঠ করুক না সে, এবং সেটা যে কথা-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত বলেই — তা বলা যায়। ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন তিনি উপন্যাসের কাহিনীকে যেন-তেন-প্রকারেণ উপস্থিত না করে শিল্পসম্মত উপায়ে রূপ দেবার চেষ্টা করেন — গল্প-পিপাসু পাঠককে প্রাথমিক আনন্দ দেবার জন্য। [illegible] গল্প আর উপন্যাসের কাহিনীর (প্লট) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির মধ্যে কালানুক্রমে সাজানো ঘটনাপ্রবাহের প্রতি পাঠকের ঔৎসুক্য, দ্বিতীয়টি কিন্তু ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কালানুক্রমিক, বিশেষত কার্যকারণগত যোগে পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে বিশেষ জোরালো ধারে রহস্যের গন্ধ — যা পাঠককে সহজেই গ্রহণ টানে। অথবা রহস্যের জন্য অনেক সময় উপন্যাসের কাহিনীর জৌলুস কমেও যেতে পারে — যখন কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় রহস্যের আমদানী হয়ে থাকে। কাহিনীর প্রতি ঔৎসুক্য আর কাহিনীর রহস্যময়তা — এই দু'য়েরই নিবৃত্তির জন্য উপন্যাসে পত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় এমন হয়, উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা বেশ সহজভাবে চলছিল, হঠাৎ রহস্যসৃষ্টির জন্য ঔপন্যাসিক এমন একটি পত্রের ব্যবহার করে ফেললেন যখন পাঠক কাহিনীর গতি প্রকৃতির উপর বিশেষ আকর্ষণ-বোধ করে উপন্যাসটি যে কোন দিকে বাঁক নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করবে তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। কখনো বা অভিনবত্বের তাগিদে কাহিনী ঘোরালো করার জন্য রহস্যের

আমদানীর প্রয়োজন হয়, তেমনও ঔপন্যাসিক এমন প্রেক্ষিত বা পট উপস্থিত করে থাকেন পট বা পটভূমি মাধ্যমে — যা পাঠককে বিমোহিত করে গল্পের পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগী করে তোলে। যে বিষয় বর্ণনা করতে ঔপন্যাসিকের অনেক লেখার পাতা খরচ করতে হতো — কৌশল করে পট ব্যবহারের ফলে তাঁকে সেটা আর করতে হয় না; উপরন্তু চমৎকারিত্বেরও সৃষ্টি হয়। শিল্পচাতুর্য সৃষ্টির প্রয়াসী ঔপন্যাসিক এই ভাবে পটের ব্যবহার করে থাকেন, বলা যায়।

স্থান - কাল - পাত্রের (character) বিশিষ্ট স্থান (Position) উপন্যাসে রয়েছে। স্থান (Place) ও কাল (Time)-এর ক্ষেত্রে পটের ভূমিকা ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল, এবার পাত্রের (চরিত্রের) প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাক। উপন্যাস চরিত্র-সম্বলিত বানানো কাহিনীর উপাখ্যান; কিন্তু এটা বাস্তবের মায়ার (Illusion of reality) আবরণে হয় এটা সত্য-কল্প। এই যে আবরণ যার ভূমিকায় প্রধান হয় এটা কিছুটা বাস্তবসম্মত, তাকে বলতে পারা যায় উপন্যাসে ব্যবহৃত স্থান ও কাল। যেহেতু বানানো কাহিনী তাই তাকে বাস্তব বা সত্য কাহিনীর কিছুটা ভান আনতে হয়, পাঠকদের মনে কাহিনীর বাস্তবতা প্রত্যয়ের জন্য। বানানো 'গল্প', যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গল্পের নামান্তর, তা পড়ার জন্য উপন্যাস পড়তে নিশ্চয়ই বসে না পাঠক। তাই ঔপন্যাসিক উপন্যাসে স্থানের বা কালের উল্লেখ করে কাহিনীর বাস্তবতা বা সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। শুধু বাস্তবের প্রামাণিকতায় এমনই যে উপন্যাসে স্থানের ও কালের ব্যবহার অনেক সময় তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে পড়তে পারে, সেগুলিকে অবশ্য আলোচনার বাইরে রাখা গেল। এই প্রামাণিকতার মুখ্য ভূমিকা পালিত হয় উপন্যাসে পট ব্যবহারে। পটে উল্লিখিত স্থান ও কালের নির্দেশ প্রায় আগাগোড়াই বর্তমান থাকে। উপন্যাসের মধ্যে যখন কোন চরিত্র অন্য কোন চরিত্রের পটে প্রবেশ করে তখন এই স্থান-কালের উল্লেখ পাঠকের উপন্যাস পাঠে অনেক সুবিধা করে দেয়। এই সুবিধা হয় যে উপন্যাসের অনেক জটিল কাহিনী ও চরিত্রের গ্রন্থিমোচনে পাঠকের সহায়ক হয়ে থাকে। তাতে তার উপন্যাস পাঠে আনন্দ অবশ্য বেড়ে যায়।

উপন্যাস ঘটনাপ্রধান না চরিত্রপ্রধান সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, বিশশতকের

উপন্যাসে চরিত্রের যে ভূমিকা দেখা যাচ্ছে তাতে এ কথা বলা বস্তুত ভুল হবে না যে, চরিত্রই উপন্যাসের প্রধান সত্য। আমরা জানি, নাটকে ঘটনার প্রাধান্য এবং মহাকাব্যে চরিত্রের। মহাকাব্যের যুগ আজ অপগত। উপন্যাস তার স্থান পূরণে প্রয়াসী হওয়ায়-তাতে চরিত্রের প্রাধান্য বেড়ে গেছে। তবে একথা মনে করলে ভুল হবে, মহাকাব্যে যে ধরণের চরিত্রের সমাবেশ, উপন্যাসেও তদ্রূপ। সন্দেহ নেই, কালের পরিবর্তনে, যুগের চাহিদায় উপন্যাসে চরিত্রের পরিবর্তন এসেছে, আধুনিক জীবনের জোয়ার ভাঁটার মধ্য দিয়ে। মহাকাব্যের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেটা ছিল না, থাকলেও যা ছিল স্বল্প সেই ব্যক্তিত্ব কিন্তু উপন্যাসে উপস্থাপিত। ব্যক্তিত্বের জন্য চরিত্রে এসেছে স্বকীয়তা। আর এটা সম্ভব হয়েছে মহাকাব্যের শ্রেণীগত চরিত্রের পরিচিতির বিলোপ সাধন করে উপন্যাসের চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মোচনে। চরিত্রের মনের গভীরে নিমজ্জিত রহস্য এবং তার স্বরূপ জানতে চায় উপন্যাস পাঠক। শুধুই উপন্যাসের আখ্যায়িকা দিয়ে আধুনিক পাঠকমন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই উপন্যাসের কাহিনীর প্রতি ঔপন্যাসিকের ততটা নজর থাকে না। চরিত্রের নাড়ি-নক্ষত্রের দিক প্রদর্শনেই তাদের বেশি উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথও আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন —

> "... নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের ঝুলুনি হাতুড়ির পিটুনী থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। ..... সাহিত্যের নব পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"[১০]

মোটকথা, চরিত্রের মনের গভীরে যে রহস্যময় জটিল দিক রয়েছে তাকে সুন্দরভাবে উন্মোচন করাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কাজ। তার এই কাজে বিশ্লেষণধর্মী সাহায্য এসেছে ঔপন্যাসিকের পত্র ব্যবহারে। পত্রের ভূমিকা চরিত্র বিশ্লেষণে ও উন্মোচনে অনস্বীকার্য। চরিত্রের মনের গোপন কথা যখন ঔপন্যাসিক সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ করেন তখনই পত্রের ব্যবহার সেই প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। যে কথা মুখে বলা যায় না, যা বলতে সংকোচ হয় সে কথা অতি সহজেই পত্রে ব্যক্ত করা যায়। লজ্জা-ঘৃণা - ভয় ও দ্বিধার বাধা পেরিয়ে চরিত্র নিজের মনের নিভৃত ব্যাপারও চিঠিতে খুলে বলতে চেষ্টা করে। গোপন মনের অর্গলিত দলিলের ভূমিকা পত্রের। তাই

মনুষ্যচরিত্রের গ্রন্থি-সন্ধির খবর দিতে পারে একমাত্র পত্র-ই। সম্বোধিত জনের যা জানাবার নয়, এমন বিষয়ও মানুষ স্বগতোক্তির মতো করে বলে ফেলেন। তেমনি পত্রের মাধ্যমে পত্র লিখক অন্তর্জীবনে পুঞ্জীভূত হয়ে জমিয়ে থাকা বিভিন্ন বিষয়ও আস্তে আস্তে মনের উপরিতলে ভাসিয়ে এনে তা আপনজন জনের কাছে বলার চেষ্টা করে। ফলে এতো দিনের গোপনীয় কথাও প্রকাশিত হয়ে চরিত্রের গূঢ় জটিল দিকের উন্মোচন ঘটায়।

আধুনিককালের নবতর সৃষ্টি উপন্যাসে সুবিধামতো উপকরণ যোগান দিয়ে তাকে রসোত্তীর্ণ ও রমণীয় করে তুলতে চেষ্টা করেন ঔপন্যাসিক। রসসংকামিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে কাহিনী ও চরিত্রে নাটকীয়তার সঞ্চারণেও ঔপন্যাসিক অবলম্বন করে থাকেন। উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার, একটি নাটকীয় কৌশল। নাটকীয়তার প্রয়োজনে পত্রের বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটক দৃশ্য কাব্য। জীবন্তভাবেই নাটকে কুশীলবদের চরিত্রমুখ মধ্য দিয়ে রূপমাধ্যমে তুলে ধরা হয়। প্রকাশ্যে নাট্যকারের আবির্ভূত হবার অবকাশ নাটকে নেই বলে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে যখন অন্তরের গভীর কথা বা মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশিত হবার পথ পায় না, তখনই নাট্যকার স্বগতোক্তি বা পত্রের বিবৃতি বা বর্ণনার ভিতর দিয়ে তা শ্রোতার সামনে তুলে ধরবার ব্যবস্থা করেন এবং তখনই চরিত্রের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজী নাটকে বিশেষ করে শেকস্পীয়রের নাটকাবলীতে এই ধরণের পত্রের ব্যবহার রয়েছে এবং ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেও পত্রের এই ধরণের ভূমিকা দেখা যায়। উপন্যাসের শিল্পগত কলাকৌশলের দিক থেকে পত্রের ব্যবহার নাট্য শিল্পরীতি থেকেই গৃহীত হয়েছে, বিশেষভাবে উপন্যাসকে বিভিন্ন প্রকারে আস্বাদনীয় করে তোলার জন্য।

আমরা পূর্বেও বলেছি, কল্পনাশক্তির সুদৃঢ়পটে বাস্তবানুগ মানব জীবনের আদলে বানিয়ে তোলা কাল্পনিক চরিত্র সম্বলিত কাহিনীই উপন্যাস। উপন্যাসে খাঁটি সত্য বা আর মিথ্যা কোনটিই নেই। সত্যমিথ্যার সংমিশ্রণে কাহিনী ও চরিত্র উপযুক্ত ভাষার যোগে উপন্যাসে রূপ পায় — পাঠক এই উপন্যাস পাঠে যখন আনন্দিত হয় তখনই বলা যায়, তা সার্থক সৃষ্টি। পাঠক উপন্যাস পাঠে মনে করে এটা যেন ঠিক তার জীবনেরই কাহিনী — আবার বস্তুত তার মনে হয়, না ঠিক যেন তাও নয়, — কোথায় যেন একটু কমতি বা বাড়তি আছে। তবু পাঠকের মনে রসাস্বাদনে কোন অসুবিধা হয় না

তাই বাস্তবজীবনের মতো করে (ঠিক হুবহু নয়) উপন্যাসের জীবনকে উপস্থাপিত করানোর ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে সব সময় তৎপর থাকতে হয়। একেই আমরা বলতে পারি উপন্যাসের বাস্তবতার সৃষ্টি (Illusion of reality)। আর এই বাস্তব-সৃজনে ও তাকে বজায় রাখতে শব্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে বাস্তবের বাতাবরণ সৃষ্টির বড় হাতিয়ার শব্দের ব্যবহার। নিত্যকার জীবনে হঠাৎ শব্দের আবির্ভাব যেমন মানসিকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সে যে কারণের শব্দই হোক না কেন — তেমনি ঔপন্যাসিকও মাঝে মাঝে পাঠকদের মনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। ভাষার দিক থেকে উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দ আবেগ-উদ্দীপনাময় হলেও তাতে বর্তমান থাকে সুস্পষ্টতা এবং সুচিন্তিত প্রকাশ। তাছাড়া শব্দের প্রতি মানুষের চিরন্তন কৌতূহল ও ঔৎসুক্য তো রয়েছেই।

ঔপন্যাসিকের জীবন-ধারণা উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট অশরীরী উপাদান। উপন্যাস রচনার সময় ঔপন্যাসিক তাঁর ভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন — সেই ভাবনার যথার্থ প্রকাশ ঘটে তখনই — যখন উপন্যাসের অন্যান্য শরীরী উপাদান, যেমন কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি তাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশে সাহায্য করে। [৪৩] আবার লেখকের ভাবনার সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত জীবন সম্পর্কে ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাবনার সঙ্গে অভিজ্ঞতার যুক্ত মেলবন্ধনে উপরেই ঔপন্যাসিকের জীবন-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিকের এই জীবন-ধারণা কখনও ধর্মীয় মূল্যায়নে উন্মুখ অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আবিষ্ট অথবা উদ্বুদ্ধ। তবে ঔপন্যাসিককে লক্ষ রাখতে হয় কোন অবস্থাতেই জীবন-ধারণা যেন উপন্যাসে সোচ্চার না হয়ে ওঠে এই জন্য যে, উপন্যাসের রসের দিক ও শিল্পের দিক তা হলে ব্যাহত হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। আর একটা কথা এই, ঔপন্যাসিকের জীবন-ধারণা সব সময় একই ধারায় প্রবাহিত নাও হতে পারে। নাট্যকার যেমন সময় অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে তার নিজের কথা ভিন্ন ভিন্ন স্বরে প্রকাশ করে থাকেন, ঔপন্যাসিক তেমনি নিজের অন্তর্লীন সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপকেও বিভিন্ন উপন্যাসে রূপায়িত করতে পারেন। যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে প্রাবন্ধিক যেমন তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা সমন্বিত জীবন-ধারণা সরাসরি পাঠকের কাছে পেশ করতে পারেন — ঔপন্যাসিকের সে সুযোগ নেই। তবে সরাসরি উপস্থিত না থেকেও ঔপন্যাসিক কৌশল করে তাঁর জীবন-ধারণা উপস্থাপিত করে থাকেন — কখনো উপন্যাসের

মিত (Theme) এর, কখনো বা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের এই বিশেষ বিশেষ চরিত্র ঔপন্যাসিকের জীবন-ভাবনার পরিচয় বহন করে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারে, অথবা পত্র রচনার পথে। যে বিষয় দুজনে কথায় ব্যক্ত করা যায় না, পত্রে তা সহজেই বলা যায় সংকোচের কণা এড়িয়ে। পত্র রচনায় — আপন মনের গোপন কথা বিশেষ জনের কাছে অবর্ণিল কালির ভাবে প্রকাশ করে নিজেকে উন্মুক্ত করা যায়॥

আলোচনায় দেখা গেল, উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, স্থান, কাল ও জীবন-ভাবনা ইত্যাদি নির্মাণে পত্রের বিচিত্র ভূমিকা ও ব্যবহার লক্ষণীয়।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. "বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। .... বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।" — বিচিত্র প্রবন্ধ (১২৯৮) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; (বাজে কথা) ; পৃঃ ৫২

২. জীবনস্মৃতি, র.র. ১০।১৪

৩. তদেব, র.র. ১০।১৬

৪. বাংলার গদ্যসাহিত্য (১৩৬৩) — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৫. বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য (১৩৫৭) — প্রণবরঞ্জন ঘোষ ; পৃঃ ১১১

৬. পুনশ্চ (১৪৪ সংখ্যক কবিতা), র.র., ৪।১৯১

৭. বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ (১৩৭৭) — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ; পৃঃ ৩৪-৩৫

৮. পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ; র.র., ১০।৫৪৪

৯. "... চিঠিপত্রে প্রথম উপাদান হচ্ছে — প্রাপকের প্রশ্নের বা তার উত্তরের সংবাদ ; শুধু তাই নয়, লেখকের মনকে প্রাপকের মনের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়, প্রাপকের ব্যক্তিত্বের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বকে কিছু পরিমাণ আত্মসমর্পণ করিতে হয় অথবা নিজের মনকে সম্পূর্ণত পরিণত করিয়া তাহার উপর প্রাপককে দাঁড় করাইয়া দিতে হইবে।"

রবীন্দ্রবিচিত্রা (১৩৬৮)— প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ৮৩-৮৪

১০. "প্রায় সব মানুষ চিঠি যদি প্রকাশিত হয়েছে।" — চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৫) — বীণা মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ৩১৪-৩১৭

১১. ছিন্নপত্রাবলী (১৬০ সংখ্যক চিঠি, শ্রী-কে ইন্দিরাকে লেখা), র.র., ১১।২৭১-২৭২

১২. ছিন্নপত্রাবলী (১১৪ সংখ্যক চিঠি), র.র., ১১।১১৫

১৩. চিঠিপত্র — ৫ম খণ্ড (পত্র সংখ্যা - ১)

১৪. ছিন্নপত্রাবলী (১১৮ সংখ্যক চিঠি), র.র. ১১।১২৪

১৫. ভানুসিংহের পত্রাবলী (৪৬ সংখ্যক পত্র), র.র., ১১।৩১০

১৬. তদেব

১৭. পথে ও পথের প্রান্তে (৩৭ সংখ্যক পত্র), র.র., ১০।৮৩৭-৮৩৮

১৮. তদেব

১৯. সাহিত্য সন্দর্শন (১৩৬৪) — শ্রীশ দাস ; পৃঃ ২৭১

১০. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব (ভূমিকা), র.র. ১২।৮০২

১০ক. "শব্দ ও অর্থের বাহন এ বাক্যের উপাদানকে আশ্রয় করেই কবি এই উদ্দেশ্য-সাধন করেন। সুতরাং যদিও কবির চরম লক্ষ্য পাঠকের মনের ভাবকে রসে রূপান্তর করা, তাঁর কাব্য সৃষ্টি মানে এই উপাদানের সৃষ্টি।"

কাব্য-জিজ্ঞাসা (কথা) (১৩৪৪) — অতুল চন্দ্র গুপ্ত

১১. ভারতকোষ (২য় খণ্ড) — সাহিত্য পরিষদ ; পৃঃ ১২১-১২২

১২. সাহিত্যকোষ । কথাসাহিত্য (১৩৬৭) — অলোক রায় সম্পাদিত ; পৃঃ ১১৩-১১৬ ; জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য

১৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ১

১৪. কালান্তর (কালান্তর প্রবন্ধ), র.র., ১৩।২১২-২২৩

১৫. সাহিত্যের পথে (সাহিত্যরূপ), র.র. ১৪।৩২৭-৩২৮

১৬. রবীন্দ্রবিচিত্রা (১৩৬৮) — প্রমথনাথ বিশী ; পৃঃ ৮০

১৭. তদেব ; পৃঃ ৮৫-৮৬

১৭ক. কাব্য জিজ্ঞাসা (১৩৪৪) — অতুলচন্দ্র গুপ্ত ; পৃঃ ৫৪

১৮. ক. "The Novel tells a story" — Aspects of the Novel (1963) — E.M. Forster ; P. 49

খ. "It is a long fictitious prose narrative with structural unity, individualised character and the pre-eminent illusion of reality."

The English Novel (1954) — (chapter — What is a Novel) — Lionel Stevenson.

গ. উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত — "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো"।

চোখের বালি (সূচনা), র.র., ৮।২২১

... এ কালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা গ্রথিত হয়ে পড়েছে গৌণ।"

নৌকাডুবি (সূচনা), র.র., ৮।৪১৮

ঘ. "কার্য-কারণ শৃঙ্খলিত চরিত্রপ্রধান ও জীবনসম্পৃক্ত নির্দিষ্ট কাহিনীই উপন্যাসের সংজ্ঞা।" — ভারতকোষ (১ম খণ্ড) — সাহিত্য পরিষদ ; পৃঃ ৫০১ ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য

২৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ৪২, ৭৭, ১২২, ১২৩

৩০. সংকলিকা (১৩৭৪) — পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশকগণের সম্মেলন ; উপন্যাসের নূতন গতি নির্ণয় (প্রবন্ধ) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়.

৩১. "কতকটা নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে গোটা জীবনকে ... দেখার এই রীতিটি মহাকবির — উপন্যাসের নাট্যকারের । কাহিনীর সর্বত্র লেখকের এই দৃষ্টি সম্প্রসারিত । যেন তিনি একটু উপর থেকে আলো ফেলে জীবনের গোটা ঘটনাকেই আলোকিত করে তুলতে চান । একটু দূর থেকে বলেই তাঁর দৃষ্টি সর্বব্যাপী কিন্তু উচ্ছ্বসিত আসক্তিতে লিপ্ত নয় ।"

বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি (১৩৭৪)— দেবী গুপ্ত, পৃঃ ১

৩২. বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড / সমগ্র উপন্যাস) ১৩৭৮ — সাহিত্য সংসদ ; ভূমিকা — উপন্যাস প্রসঙ্গ — যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃঃ ৩৭

৩৩. সাহিত্যকোষ / কথাসাহিত্য (১৩৬৭) — অলোক রায় সম্পাদিত ; পৃঃ ১৩৩ ; বীরেন্দ্র দত্তের বক্তব্য।

৩৪. "... কোন প্রকাশক কয়েকটি আদর্শ পত্রাবলী রচনার জন্য তাঁহাকে (রিচার্ডসন) অনুরোধ করেন । এই অনুরোধের ফলেই হইল যুগান্তকারী সৃষ্টি — ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'পামেলা' ।"

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬১) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ১১২

৩৫. "দুটো থাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ ; ঘটনা বা পরিস্থিতির পারম্পর্য মানুষের চিন্তা কাজ এবং চরিত্রের সম্বন্ধে একটি পরিবর্তনের ধারা এবং লেখকের মূল বক্তব্যের পরিপোষক উপাদানগুলি সুনির্বাচিত প্রয়োজন ।"

উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৭১) সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; পৃঃ ৩৬

৩৬. Samuel Richardson Post-Script to Clarissa, the History of a Young Lady (1747 - 48)

৩৭. তদেব

৩৮. Samuel Richardson — Preface to Clarissa, the History of a Young Lady (1747 - 48)

৩৯. Samuel Richardson — Post-Script to Clarissa, the History of a Young Lady (1747 - 48)

৪০. তদেব

৪১. "... by varying your correspondents you can get different views of the same event, and first hand manifestation of extremely different characters " .

The English Novel(1913),George Saintsbury ; P: 19

৪২. "মানব জীবনে অভিজ্ঞতা বিশেষের প্রবৃত্তিতে যে গভীর ভাবাবেশ সৃষ্টি হয় সেই ভাবাবেশকে পত্র লিখন পদ্ধতিতেই সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় । এই পদ্ধতিতে চরিত্রদের জীবনের বর্তমান মুহূর্তে যে ঘটনা ঘটে বা যে চিন্তার উদয় হয় ঠিক সেই মুহূর্তের বর্ণনাই দেওয়া যায় । কিন্তু অন্যসব বর্ণনা পদ্ধতিতে যা ঘটে গেছে তারই বর্ণনা থাকে । সেই বর্ণনা প্রথমটির মত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না ।"

Novelists on the Novels — M. Allott ; P: 256

উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র - (১৯৭২) — সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; পৃঃ ১২৮ থেকে উদ্ধৃত ।

৪৩. সাহিত্য (কবি জীবনী), র.র., ১৩।৮২১

৪৪. Novelists on the Novels (1965), Ed. by Miriam Allott, P: 260

৪৫. চোখের বালি (সূচনা ভূমিকা) ; র.র., ৮।২২১

৪৬. সাধারণভাবে উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা :—

"The Novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and individual attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and character to the central idea."

বলার অপেক্ষা রাখে না, উদ্ধৃতির ' Central idea ' লেখকের জীবন-ধারণারই বিশিষ্ট মূর্তি ।

'Mukherjee's Magazine ' -এর সম্পাদকের কাছে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা চিঠির অংশ —

Letters to Dr. Sambhunath Mukherjee dt. 27.3.72, Berhampore —

Bankim Rachanavali (Sansad Edition), P: 171 (English Works).

ভূমিকা — খ. পরিশিষ্ট

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার —
কবিকঙ্কণ, মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' (চণ্ডীমঙ্গল)
কাব্যে, কবি-দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'
জীবনী গ্রন্থে, বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে।

আধুনিকযুগের গদ্যের প্রাথমিক বাংলা সাহিত্য —
রামরাম বসুর 'লিপিমালা',
শ্রীমধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা',
বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত 'কমলাকান্তের পত্র',
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা, এবং
রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ও ছোটগল্প।

বাংলা সাহিত্যে পত্রের ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিক করে বলা যায় না। মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে যে পত্রের ব্যবহার হতো তার নিদর্শন রয়েছে। আধুনিক যুগে কথা-সাহিত্যে পত্র ব্যবহারের যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায় — মধ্যযুগে সেটা ছিল না — তা বলবার কথাও নয়। আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা মধ্যযুগে আশা করা যায় না তবে আধুনিক কবি-মানস নিয়ে এক কবির ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভাব ঘটেছিল — তিনি হলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দচক্রবর্তী। জীবনরসিক দুঃখী বাস্তব-বাদী এই কবি আধ্যাত্মিকতার পরিবেশে সুখদুঃখ পরিবেশনে মধ্যযুগে ছিলেন অদ্বিতীয়। নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে লোক চরিত্রের অভিব্যক্তিতে তিনি অবলীলায় বিশ্লেষণ করতে পারতেন। ঔপন্যাসিক[1] না হয়েও মধ্যযুগের দৃষ্টিকোণ থেকেই কবিকঙ্কণ তাঁর "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে দু'খানা পত্রের ব্যবহার করেছেন। 'স্বামীকে যমের হাতে দেবো তবু সতীনের হাতে নয়' — এই প্রবাদ বাক্য থেকে বোঝা যায় বাংলা দেশে সতিনের ঘর করা কী দুর্বিষহ ও মারাত্মক ছিল। স্বামী বিদেশে, সতিন খুল্লনাকে সহ্য করতে পারে না লহনা। এই সতিনকাঁটাকে কি ভাবে দৈহিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতিত করা যায় — তার জন্য লহনা স্বামীর নামে সৃষ্টি করে 'কপট পত্রিকা লেখ'। সে জেনেছে, স্বামীর পত্রের আদেশ খুল্লনা অবশ্যই নিখুঁত করে পালন করবে। বস্ত্র-অলংকার নারীর অত্যন্ত প্রিয় — সেই বস্ত্রগুলি কেড়ে নিতে বললে তার মনে প্রবল আঘাত দেওয়া হবে। স্বামী যদি সতিন লহনাকে 'পরম পীরিতি' জানিয়ে আশীর্বাদ করে সংসারের ভার তার উপর অর্পণ করেন, অপর পক্ষে সে বিষয়ে খুল্লনার নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করেন; তবে স্বামীর প্রতি তার অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সব ভেবে চিন্তে খুল্লনাকে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দেবার জন্যেই এই কপট পত্রের অবতারণা করা হয়েছে —

"তোমারে সঁপিনু সর্ব গৃহস্থের ভার।
খুল্লনার নিবে তুমি যত অলংকার॥
এক এক শাড়ি দিবে ছেঁড়া আভরণ।
নিযুক্ত করিবে তারে ছাগ রাখনে॥
বিবাহ করিল যবে নষ্ট ছিল হেতু
রাখিবে ঢেঁকিশাল পাশ — প্রতিজ্ঞার হেতু॥
. . . .

পরিবারে খুঞা দিবে উচিত খোমলা ॥
এ রংশয়ের তরে রাখবে ঝাপা ।
নিযুপি করিয়া দেবে তর্কামের মস্তক ॥
তোরে বলি দিয়ে মোর শান্তির আদেশ ।
রায়ের আদেশে সীতা গেল বনবাস ॥
নত্র না শানিলে তোমার পুণ্যবৈর কেশ ।
করিব দোষের শাস্তি কহিনু বিশেষ ॥ [২]

এই ষড়যন্ত্র দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না —'নারীই নারীর সবচেয়ে বড় শত্রু' । নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে মধ্যযুগে কবিকঙ্কণের মতবড় বড় একটা কেউ ছিলেন না ।

দীর্ঘ প্রবাসে গিয়েছেন যাবার প্রাক্কালে ধনপতি সদাগর খুল্লনার উক্তি থেকে জানতে পারলেন , তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা । তখন ভবিষ্যতে তাঁর অনুপস্থিতিতে নবজাতক তাঁর সন্তান হিসেবে যাতে সমাজে স্বীকৃতি পায় সেইজন্য সদাগর খুল্লনাকে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ 'জয়পত্র' লিখে দিলেন । ধনপতি সদাগরের ওই পত্রটিতে খুল্লনার প্রতি কতকগুলি নির্দেশ ছিল — যা ভবিষ্যত ব্যাখ্যাপ্রিয়া নির্দেশক । —

"... তোমারে আশীর্বাদ দিয়ে পত্র লিখিতি ।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিয়ে লিখিতি ॥
এখন তোমার গর্ভ হৈল পঞ্চমাস ।
যেনকালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস ॥
তুমি কন্যা যদু শশিকলা নাম থোবে ।
দেখিয়ে উচিত বরে তারে বিয়া দিবে ॥
যদি পুত্র হয় তবে থোবে শ্রীপতি ।
গজাল্লা পুনাল্লা পুত্র করিবে মুখাতি ॥
এবার সংসারে তুমি হবে প্রাণধন ।
আমার উদ্দেশে যাবে দক্ষিণ পাটন ।" [৩]

কবি-সার্বভৌম মুকুন্দরাম কবিরাজের রচিত সংজীবনী (Hagiography)

''চৈতন্যচরিতামৃত' — এর অন্ত্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে একটি পত্র কৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ভূমিকা সম্বলিত পত্রটি বৈষ্ণবধর্মের এক গূঢ়তত্ত্ব 'তরজা প্রহেলী'তে রচিত — এই জন্য যে, 'প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে'। উক্ত জগদানন্দের মারফৎ প্রেরিত চৈতন্যদেবের (১৪৮৬ - ১৫৩৩) প্রতি একনিষ্ঠ ভক্ত আচার্য গোসাঁই - এর পত্র —

''... আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিহ লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিহ হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ ইহা কহিয়াছে বাউল॥''[৪]

সন্তজীবনীতে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহার কেমন হতে পারে তার পরিচয় নেয়া গেল। অবশ্য এর সঙ্গে কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত পত্রের তুলনাই চলে না।

মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের প্রচলন ছিল না, গদ্যভাষা তখনও সাহিত্য রচনার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। তাই সাহিত্যে ব্যবহৃত চিঠিপত্র পদ্যে রচিত হতো। পয়ারে লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ —

নিবেদন মহাশয় শ্রীপাদপদ্মেতে।
জানিবে সর্ব শুভ হই পরস্পরেতে॥
ভবতা প্রেরিতা লিপি পাইয়া পূর্বেতে।
অবগত আছি তত্র মর্ম যাহাতে॥
কর্মান্তরে প্রত্যয়ে উক্ত প্রেরণ।
গৌণ হইয়াছে ইহা নিবেদি চরণে॥[৫]

তখন ব্যক্তিগত সংবাদবাহী ক্ষেত্রে চিঠিপত্রে গদ্য ও পদ্যের সমান ব্যবহার ছিল। সাধারণ লোক কবিত্বশক্তির অধিকারী না হওয়ায় গদ্যেই চিঠিপত্র লিখত। তবে শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষায় চিঠিপত্র লিখতেন, তাও জানা যায়।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

আধুনিকযুগে ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষ রূপ পায়। গদ্যের আঙ্গিকে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা কিন্তু বলা যায় না। কেননা পত্রাকারে সাহিত্যের নিদর্শন যথাযুগে রয়েছে।

বৈষ্ণব-মহাজনপদকর্তাদের মধ্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদরচয়িতার সাক্ষাৎ মেলে যাঁরা প্রাচীন বাংলা ভাষায় গদ্যের আঙ্গিকে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। পদকর্তা চন্দ্রশেখর ও বৈষ্ণবদাসের দুটি পদ উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। চন্দ্রশেখরের পদটি —" দুন্দুভিদুন্দুভয়োহ্' ... এবং বৈষ্ণবদাসের —'দিঁড়িয়ে কররুদ্ধপাটি' । ...[৭]

আধুনিকযুগের সূচনায় গদ্যের আঙ্গিকে মৌলিক কথা গ্রন্থের রচয়িতা রামরাম বসু (অনুমানিক ১৭৫৭-১৮১৩ খ্রীঃ)। তাঁর রচিত গ্রন্থ লিপিমালা (১৮০২ খ্রীঃ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে অনুমোদিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত। তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা কথ্য ভাষা শেখার তালিম দেবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হলেও[৮] বিষয়বস্তু এবং রচনারীতির প্রতি লেখকের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। চিঠিপত্রের মতো গদ্যে সজ্জিত এই গ্রন্থ — শুধু সম্বোধনটি ছাড়া অন্যগুলি যথার্থ গদ্যের নজির হিসেবে ধরা যায় না। পত্র রচনার কায়দায় রচিত এটি প্রবন্ধ বা আখ্যানগ্রন্থ। "গ্রন্থটি পত্রের আকারে লেখা হলেও পুরোপুরি পত্রলিখনের রীতি অনুসারে লেখা হয় নি।"[৯] গল্প বলার ইচ্ছায় লেখক পত্রাকারে বানানো কাহিনী, নানা ধরনের সংগৃহীত উপকথা ও আখ্যান জাতীয় রচনা এবং পুরাণ ও বাইবেলের গল্প বিবৃত করেছেন। বইটিতে নাটকীয় কৌশল, সজীবপূর্ণ ভাব, প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার, কথ্য রীতির চাল রয়েছে, যা সুধু-পণ্ডিতীয় সাধুরীতির সমগোত্রীয় নয়। যদিও 'চলিত' ভাষা রপ্ত করানো যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, সেখানে পত্র-সাহিত্যের বিশুদ্ধ সৌরভ খুঁজে বেড়ানো পণ্ডশ্রম মাত্র। পত্রাকারে এই গ্রন্থ রচনার পিছনে অন্য কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নেহাতই পত্ররচনারীতির আঙ্গিকে এই গ্রন্থ রচিত।

আধুনিককালে 'সম্পাদক সমীপেষু' শীর্ষক প্রকাশিত চিঠি-পত্র, সাময়িক পত্রের সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে পাঠকদের দ্বারা রচিত হয়ে থাকে। এই ধরনের পত্র, পত্র-সাহিত্য বা সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত নয়। এরা সর্বজনীন শ্রেণীর। পত্রলেখক ভিন্ন ভিন্ন বলে,

বিষয় এক স্বতন্ত্র মর্যাদা. এই ধরণের চিঠির মধ্যেও বিভিন্নতা থেকে থাকে । এদের সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না । কিন্তু এই ধরণের পত্রের মাধ্যমেই বাংলা উপন্যাসের সূচনাকারী 'বাবু' শ্রেণীর উপাখ্যানের উদ্ভব ঘটেছিল বলা যায় । কলকাতা সমাজের এই বিচিত্র 'বাবু' শ্রেণীর চরিত্র সেই সময়ে সাময়িক পত্র-পত্রিকার বহু আলোচিত বিষয় ছিল । সমালোচকের মতে —

> “সমাচার দর্পণে (১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি । ১৪ই ফাল্গুন ১২২৭ এবং ৯ জুন । ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮ তারিখে) 'বাবু উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় । ... এই রচনাটি যথার্থ বাবু চরিত্র । এই ধরণের কাল্পনিক (fictitious) অথচ বিশ্বাস্য (Convincing) আটপিক জীবনচিত্র 'সমাচার-দর্পণে' আরো অনেক বেরিয়েছিল । .... এগুলি কোন ক্ষেত্রেই সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্রাকারে প্রকাশিত । এখানে চিঠিপত্রের বিদ্রূপাত্মক চরিত্র-চিত্র তৈরীর কাজে লাগানো হয়েছে ।”[১০]

প্রসিদ্ধ রোমক কবি পাবলিয়াস ওভিডিয়াস নাসো বা সংক্ষেপে ওভিদের (খ্রীঃ পূঃ ৪৩- খ্রীঃ ১৭ অব্দ) ' Heroides ' (Heroic Epistle) শীর্ষক পত্রকাব্যের আদর্শে ও অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬২) রচনা করেন । ওভিদ তাঁর কাব্যকাহিনীর বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন গ্রীক পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে । মধুসূদনও ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে তাঁর কাব্যের কাহিনী চয়ন করেছিলেন । সংস্কৃত সাহিত্যের নাটক ও কাব্য সম্পর্কে মধুসূদন ওয়াকিবহাল ছিলেন । সংস্কৃত সাহিত্যে পত্রকাব্যের দেখা মেলে না বটে, নাটক ও কাব্যে পত্রের ব্যবহার রয়েছে । মহাকবি কালিদাসের কাব্যনাট্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্র আছে ।[১১]

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, রুক্মিণী 'প্রেমসন্দেশ' প্রেরণ করছেন শ্রীকৃষ্ণকে ।[১২] সংস্কৃত কাব্য নাটকে প্রণয়ালাপকে এই ধরণের পত্র অথবা 'প্রেমসন্দেশ' প্রেরণের রীতি সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে 'সাহিত্যদর্পণ'-এর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন ।[১৩] এই দিক থেকে, মধুসূদন পরোক্ষভাবে যে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কাব্য রচনায় ব্রতী

যখনি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ওভিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব তো ছিলই। আমাদের জানা আছে — কবি তাঁর 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১) রচনার সময় এই কাব্য সম্পর্কে নিজের মতামত চিঠিতে বন্ধুদের জানাতেন। এই কাব্য রচনায় তিনি অলংকার-শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বিশ্বনাথের অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, তাও বলেছিলেন।[১৪] কিন্তু কবি তাঁর এই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারেন নি। কারণ এই কাব্যেই তিনি বিশ্বনাথের অনুসরণে মহাকাব্যের সর্গ বিভাগ এবং আরও অন্যান্য বিষয়ও মেনে নিয়েছিলেন। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই জন্যেই পরবর্তীকালে 'বীরাঙ্গনা' রচনায় কবি প্রতীচ্যদেশীয় সাহিত্যের অনুসরণের কথা কোথাও উল্লেখ না করলেও কবির ভিতরে ভিতরে অন্তঃধারার মতো তাঁদের প্রভাব কাজ করে গেছে।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে আধুনিক প্রেমিকাগণই পত্রিকা-রচনা করে তাদের প্রেমিকদের কাছে প্রেরণ করেছেন। পরবর্তীতে প্রেমিকদের মধ্যে কেউই পত্রের প্রত্যুত্তরের অবতারণা করে কোন পত্র রচনা করেন নি। এই দিক থেকে কিন্তু ওভিদের কাব্যে তিনটি ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে — প্যারিস ও হেলেন, লিয়াণ্ডার ও হেরো এবং একন্টিয়াস ও সাইডিপ — এই তিন প্রেমিকের লেখা তিনটি পত্র। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের একাদশটি পত্রিকার মধ্যে 'বীরবাহুর প্রতি জনা', আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই উদ্ভূত এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সমুজ্জ্বল। এই পত্রটি বাদে বাকী অন্য দশটিই প্রেমপত্র। পত্রিকার আদলে রচিত 'বীরাঙ্গনা' নিঃসন্দেহে পত্রকাব্য। তবে পত্রিকাগুলির মধ্যে নাটকীয়, কাব্য ভাবোচ্ছ্বাস এবং সর্বোপরি কাহিনীগত রস মিলেমিশে এক অপূর্ব মৌলিক আস্বাদের সৃষ্টি করেছে। Dramatic monologue - জাতীয় রচনায় গীতিরস ও নাট্যরস - এর মেলা-মেশাতেই 'বীরাঙ্গনা' এক অপূর্ব পত্রকাব্যের রূপ পেয়েছে। প্রেমের কবিতা হিসেবে প্রাধান্য এই পত্রিকাগুলির রচয়িত্রী, কুমারী, বিবাহিতা নারী ও স্বর্গের অপ্সরা। তাদের জীবনের বিচিত্র অবস্থা, উপরন্তু বিবিধ প্রেমের বিভিন্ন কাহিনীর বিষয়ও প্রতিফলিত হয়েছে এই পত্রিকাগুলিতে। আবেগ-উচ্ছ্বাস, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, আশা-হতাশা, মিলন-বিচ্ছেদ, কর্তব্য-অকর্তব্য, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, ক্রোধ-ক্ষোভ, এবং অন্তর-যাতনা ও অনুভূতি ইত্যাদি সম্বলিত নায়িকাদের মনের গোপন অবস্থার আলেখ্য এই পত্রিকাগুলি। তবে এমন নিখুঁত আলেখ্য রচনার মূলে আঙ্গিক-আধার পত্ররচনারীতি। হৃদয় মনের গোপন কথা — পত্রেই তার অকপট স্বচ্ছন্দ প্রকাশ স্বাভাবিক। তারাকোন

আঙ্গিকে এমনি সুষ্ঠু, সুন্দর ও চমৎকার প্রকাশ সম্ভব নয় বলেই পত্রিকার আকারে এই গ্রন্থের কবিতাগুলি এমন রূপগ্রাহী রূপ পেয়েছে।

'পত্রাবলী' / পূর্ণিমা (১৯৭৮) নামে একখানা পত্রকাব্য রচনা করেছেন পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের আদর্শে অত্যাধুনিক এই কবি একুশটি পত্রিকা সম্বলিত এই কাব্যটি রচনা করেছেন। প্রথম পত্রিকাটি 'মধুসূদনের প্রতি হেনরিয়েটা'। দ্বিতীয় পত্রিকা 'মহাকবি কালিদাসের প্রতি শকুন্তলা' অন্য বাকীগুলি রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন নায়কদের প্রতি নায়িকাদের রচিত পত্রিকা। বৈশিষ্ট্যহীন এই কাব্যটি মধুসূদনের ভোঁতা অনুকরণ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮ - ১৮৯৪)- এর 'কমলাকান্তের পত্র' প্রবন্ধ আলোচনার আগে, তাঁরই রচিত 'লোকরহস্য' (১৮৭৪ খ্রীঃ) গ্রন্থের অন্তর্গত পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধ 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র' সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। পত্রের আঙ্গিক-কৌশলে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছেন, তা এক কথায় চমৎকার। এই পত্র-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বিদেশী ধারক-লেখকদের (সবাই অবশ্য নন) বাঙলাদেশ ও বাঙালীদের সম্বন্ধে যে জ্ঞানের অপ্রতুলতা ছিল তাকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেখাতে চেয়েছেন। সাহেব হলেই যে জ্ঞানী-গুণী হবেন এমন কোন কথা নেই। তাঁরা যে সবাই সব বস্তু সঠিকে প্রকাশ করেন তাও নয়। আর সাহেবদের মধ্যেই তখনকার বাঙালীরাও যে কল্পনায় তাঁদের জ্ঞানের আকাশচুম্বি সৌধ-নির্মাণ করতো — তাও যে কত অসার, উদ্ভট ও হাস্যকর — সেটা উদ্ঘাটন করাই এই পত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই সব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত (?) দের মধ্যে রয়েছেন Dr. Lorinser & C. এবং প্রফেসর স্টুয়ার্ট হোরাস্। তাঁদের আজগুবি ও উদ্ভট মতামত এমন রসাল কৌতুকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্র-প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন যে, পড়তে পড়তে পাঠকদের হাসি সম্বরণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কে যে কী অদ্ভুত ও অলীক ধারণা ছিল এই সব তথাকথিত পণ্ডিতদের, তার একটু নমুনা উদ্ধৃতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে —

"হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে — তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে

(আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ।

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর ।"[১৫]

বিজেতার দৃষ্টিতে বিজিত জাতি কত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র, তার পরিচয় দিয়ে দেশের মানুষের স্বাদেশিক চেতনা জাগানোর মতো পুরুদাস্থিতের বিষয়টিকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদ-পত্রের আবরণে সরস এবং অন্তরঙ্গ আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন । নৈকট্য এবং অন্তরঙ্গতা সঞ্চার করার গুণ যে কেবল পত্রেরই, প্রবন্ধের নয়, এ ধারণা তাঁর স্পষ্ট ছিল ।

'কমলাকান্তের পত্র' এই শীর্ষনামে পাঁচটি পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫ খ্রীঃ) -এর অন্তর্গত । পাঁচটি পত্রের প্রত্যেকটি বঙ্গদর্শনের (১৮৭২ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত) সম্পাদক মহাশয়কে সম্বোধন করে লেখা এবং পত্রের সমাপ্তিতে কমলাকান্ত তৃতীয় ও পঞ্চম সংখ্যায় নিজে স্বাক্ষর করেছেন । নিজের নাম কিন্তু বাকি তিনটিতে না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওগুলি কমলাকান্তেরই লেখা । পত্রের আঙ্গিকে পাঁচটি প্রবন্ধ রচনার সার্থকতাই এইখানে যে, প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর বিষয় অত্যন্ত সহজ সরল সুরে পাঠকদের গোচরে আনার চেষ্টায় প্রাবন্ধিক একান্তভাবে পাঠকদের মনের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। আপনজনের কাছে মানুষ নিজেকে উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হয় — অচেনার কাছে যেটা সম্ভব হয় না । পত্র-রচনার মাধ্যমই হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর পন্থা, যার দ্বারা লেখক পাঠককে সহজেই হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেন । যার ফলে পাঠক আড়ি পেতেও লেখকের মনের গভীর গোপন কথা শুনতে আগ্রহী হয় । আর এর পিছনে রয়েছে একটা বিশ্বাসবোধ । পত্রের মাধ্যমে গভীর অন্তরঙ্গতায় ঘটনাকে এমন বাস্তব-প্রতীতিযুক্ত করে লিপিবদ্ধ করা যায়, যাতে পাঠকের মন সহজেই লেখকের বক্তব্যে বিশ্বাসবান হয়ে ওঠে । যদিও তার পিছনে সব সময়েই সত্যতা খুঁজতে গেলে ভ্রান্তিকেই ডেকে আনতে হয় । পত্রাকারে রচনার সার্থকতার আর একটা দিক, প্রবন্ধকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা । প্রাবন্ধিক নিজের মনের অনেক কথাই পাঠকদের অন্তরে সহজ অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র হিসেবে পত্রাকারে প্রবন্ধ রচনায় প্রয়াসী হয়ে থাকেন ।

কমলাকান্তের আলাপচারিতার ভঙ্গী সেই সময়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর পাঠকদের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল ।

'কমলাকান্তের দপ্তর' - এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য পত্র - পঞ্চকেও বর্তমান । হাস্য - কৌতুক, রঙ্গ - ব্যঙ্গাত্মক শানিত নিপুণ শ্লেষপূর্ণ মনোভাব হালকা ধরণের রমান্য আলোচনার পরে পরেই অনেক ভাব - গভীর জ্ঞানের কথা, চিন্তার কথা এগুলিতে এসে উপস্থিত হয়েছে । প্রবন্ধপাঠে একটু মনোযোগী পাঠক তা লক্ষ্য করে থাকবেন ।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সম্পাদক থাকাকালীন 'বঙ্গ-দর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল । কমলাকান্তের পত্রগুলি দ্বিতীয় দশায় তিনি রচনা করেন এবং তৎকালীন 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক, অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে* প্রেরণ করেন প্রকাশ করার জন্য । প্রথমেই তাই তিনি প্রথম পত্র প্রবন্ধে হালকাভাবে লেখক হিসেবে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রত্যাবর্তনের ভূমিকা করেই, সম্পাদক হিসেবে 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য কি ধরণের রচনা তিনি কমলাকান্তের কাছে প্রত্যাশা করেন তা জানাবার জন্য 'কি লিখিব'? — এই পত্র-প্রবন্ধের অবতারণা করেন । এই পত্রে কমলাকান্ত বলতে চেয়েছেন, সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার রচনা তিনি লিখতে অভ্যস্ত — যেমনটি সম্পাদক চান, তেমনই তিনি রচনা করে পাঠাতে সক্ষম । সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সাহিত্যশাখার রচনার অকিঞ্চিৎ-করতা নানা রঙ্গ-ব্যঙ্গের অবতারণা করে তিনি তাঁর রচনা সরস করে তুলেছেন । একটু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল —

> " এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয় — আপনার চাই কি ? .... নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার ? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব ? ... গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব ? আমার রচনার মূল্য আপনি গজদরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন ? ... আপনি কোটেশ্যান ভালবাসেন, না ফুটনোটেই আপনার অনুরাগ ? যদি কোটেশ্যান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন ।"[১৬]

শেষ পত্র-প্রবন্ধ 'কমলাকান্তের বিদায়' — বিষাদঘন অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে বিদায়ের

* (১৮৩৪ - ১৮৮৯)

করুণ ঘন্টাধ্বনি উচ্চকিত —'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক, পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে ও সংসারের কাছ থেকে। অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিচিতিতে নেমে আসে বিচ্ছেদের নিবিড় বেদনা। সকলকেই একদিন বিদায় বেদনা ভোগ করতেই হয় — পৃথিবী চির-দিনের আঁকড়ে থাকার স্থান নয়। এক দিনের রূপ আর সুখের আনন্দ-উজ্জ্বলতা অবশেষে ম্লান হয়ে আসে — নবীনকে তার জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়। কিন্তু পোড়া মন তা মেনে নিতে চায় না বলে যত অশান্তি এবং দুঃখ ভোগ — তখন কান্নাই একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয়। উপসংহারে কমলাকান্ত তাই বলে ওঠেন —"তবু কাঁদি। অনিবার্যমাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।"[১৭] এমনি ভাবে অন্য তিনটি প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ভাব কত সহজেই চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

কমলাকান্তের পত্র পাঁচটিতে, পত্রের আঙ্গিক গ্রহণ করে যে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার যোগসূত্র বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন তা কখনোই যথার্থ প্রবন্ধ রচনার ভিতর দিয়ে সম্ভব হতো না; এখানেই পত্রাকারে বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের পত্র' রচনার সার্থকতা।

দপ্তর, পত্র, জোবানবন্দী — এই তিন অংশ মিলিয়ে কমলাকান্তের গোটা লেখা। তাতে এই নেশাখোর ছন্নছাড়া অদ্ভুত প্রকৃতি জীবনরসিক মানুষটির যে ট্র্যাজিক মূর্তি কিছু উপাদানের আভাসে একটা গল্প-গল্প গড়নে দানা বাঁধতে চেয়েছিল (যাতে পত্র আছে, ডায়েরির ইশারা আছে, অতীত স্মৃতিচারণার আত্মকথা প্রকাশের যন্ত্রণামধুর প্রবৃত্তিও ফুটেছে), তার মাঝে এই সমগ্র রচনাটি আমাদের মূল গবেষণা বিষয়ের গোড়ার দিকের অবিনাশ্য নিদর্শন হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কমলাকান্তকে বাঙালী আজও ভুলতে পারেনি। ঘুরে ফিরে তাঁকে পাঠকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। তাই ১৩১০ সালেও প্রকাশিত হয় পত্রের আঙ্গিকে রচিত মনমোহন ঘোষনবিশ-এর 'কমলাকান্তের বঙ্গদর্শন'।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) -এর প্রসাদগুণে ভরা চিঠিপত্রের যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। চিঠিপত্রের সহজ অকপট প্রকাশ — পত্ররচনার এই বিশেষ দিকগুলি তাঁর চিঠিতে উপস্থিত থাকায়, পাঠকদের দৃষ্টি এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হতো। দরাজহৃদয়ের অধিকারী

এই রসিক মানুষটির পরিচয় তাঁর লেখা চিঠিপত্রের পঙক্তিতে পঙক্তিতে ছড়ানো রয়েছে। আবার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর চিঠিপত্রে একেবারে অনুল্লেখ্য নয়। আপন স্বভাবের যথার্থ চিত্র তাঁর চিঠি-পত্রে প্রকট। পাঠক সহজেই লেখকের মনের গোপন কথার ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারে বলে — লেখক ও পাঠকের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের অবকাশ থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতায় লেখা চিঠি অনেক আছে। নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা 'জন্মদিনের চিঠি'র উল্লেখ করা যায় —

"অবতরণিকা
পাইয়া যে দিন সাধের নাতি
ফুলিল দাদার বুকের ছাতি
সেইদিন আজ দেখা দিয়েছে।
দিন দাদাজির পুণ অসীম
পানে আনসেন, আকারে ভীম,
চিরজীবী হয়ে থাকুক বেঁচে।" ... [১৮]

দাদু-নাতির সম্পর্কটি কি মধুর। নির্মল হাস্যরসের কারবারী হিসেবে এই পত্র কবিতায় তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন। এই পত্রের কৌতুকপ্রবণতা তাঁর অন্যান্য প্রায় সব চিঠিতেই লক্ষ্য করা যায়। রসিকতা তাঁর সহজ মনের নিভৃতে সব সময়েই বিরাজ করত। Wit ও Humour -এর ব্যবহার তাঁর পত্রে প্রচুর দেখা যায়। কবি বিহারীলালের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এই কবি-দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথের মধুর বন্ধুসুলভ স্বভাবের পরিচয় সম্বলিত একটি কবিতা, পত্রের আকারে লিখেছিলেন, কবি বিহারীলাল,* তার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল —

....
আপনার তেজঃ গর্ব নয় ব্যবহার,
কতদূর শক্তি ধরে মন মোহিবার ;
সরল মধুর ভাব খোলা আলাপন,
কতদূর করেছে আমারে আকর্ষণ,

---

* (১২৪২-১৩০১ বঙ্গাব্দ)

হয়তো সে নিজে তাহা জানে না নয়,
চন্দ্রমা জানেনা তার করে কত যশ্ ।
শশি যে চকোর করে তোমার ধেয়ান,
খেকোনা মেঘের আড়ে, বোঝোনা পরাণ । ... ১১

সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট রূপ দিতে গেলে বিষয়ানুসারী যেমন ভাষার প্রয়োগ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কি ধরণের আঙ্গিক গ্রহণ করলে পাঠকদের মনের সবচেয়ে কাছাকাছি এসে তাকে সহজেই আকর্ষণ করা যায় সেটা নির্ধারণ । ভালভাবে ভেবেচিন্তেই সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে বিশেষ এক আঙ্গিকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হন । আঙ্গিকগত দিক থেকে পত্ররচনারীতি এমন একটি মাধ্যম যাকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক যে কোন শ্রেণীর, যেমন কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদির সুষ্ঠু রূপদান করতে পারেন । বহুমুখী বিদ্যুৎস্পর্শী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) অবলীলায় এই পত্র মাধ্যমকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম প্রধান মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে, কবিতা, প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী, ছোটগল্প (উপন্যাস ছাড়া) কি না সৃষ্টি করেছেন । এক একে এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে রচিত কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, ছোটগল্পের আলোচনায় অগ্রসর হবো ।

দীর্ঘ ৮১ বছরের জীবনে রবীন্দ্রনাথ অজস্র পত্র রচনা করেছেন । প্রকাশিত পত্রের সংখ্যা এখনো অনির্ণীত । কবি বার বারই বলেছেন, (নানা উপলক্ষে) তিনি মুখ্যত কবি — গৌণত অন্যান্য বিষয়ের রূপকার । তাই পত্র রচনার মাঝে মাঝেও কবি সত্তাকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি । পত্র রচনার মধ্যেও তিনি কবিতা রচনা করে ফেলতেন, এমন উদাহরণ প্রচুর । তাঁর রচিত গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রও তিনি অনেক সময়েই কবিতায় রচনা করতেন, কখনো বা পত্রের আকারেও । আবার শুধু কবিতাতেই তিনি বহু পত্র রচনা করেছেন এবং কখনো বা তাঁর কাছে যে সব পত্র, কবিতায় রচনা করে তাঁর গুণগ্রাহীরা পাঠাতো, তারও উত্তর কবি পত্র-কবিতা রচনা করে দিতেই ভালোবাসতেন । আমাদের এখনকার আলোচ্য সেইসব পত্রকবিতা যা তাঁর কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছে ।

"কড়ি ও কোমল" (১২৯৩) কাব্য গ্রন্থের দুটি কবিতা 'পত্র' ও 'মঙ্গলগীত',

পত্রাকারে রচিত। 'পত্র' শীর্ষ নামের পরেই কবি লিখছেন —'নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত'। বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) মহাশয়কে কবি পত্রটি লিখেছেন, কৌতুককর সম্বোধন এইরূপ —'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু'। পত্র-কবিতাটির ইতি টেনেছেন এই পংক্তি দিয়ে —'রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও।' আমরা রবীন্দ্রজীবনী [২০] থেকে জানতে পারি এই সময়ে (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথ 'রাজহংসে' স্টীমারে বসবাস করছিলেন কিছু দিন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) -এর স্টীমার কোম্পানীর এই জাহাজটি। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এখানে এসে দিন কয়েক থাকবার অনুরোধ করেছেন কবি। কিন্তু তিনি এলেন না অগত্যা রবীন্দ্রনাথকেই স্টীমার ছেড়ে লোকালয়ে আসতে হল এবং বন্ধুকে লিখলেন —

"জলে বাসা বেঁধেছিলেম ডাঙায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।" [২১]

পত্রকবিতাটি ব্যঙ্গাত্মক। সেই সময়কার নব্য হিন্দুসমাজের প্রতি কবির অশান্ত মনোভাব প্রকাশিত। কবি-আত্মা এই রকমের সাহিত্য রচনায় উৎসাহী কখনোই নয় — কিন্তু অনেক সময় নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারী হয়ে কবিকে এই ধরণের কবিতা রচনার জন্য বাধ্য হয়েই কলম ধরতে হয়েছে।

'মরনগীত' কবিতারি তিনটি অংশ। প্রতি অংশই নাসিক থেকে কবির ভাইঝি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩ - ১৯৬০) কে লেখা। প্রথম অংশের পত্র শেষে কবি ইন্দিরাকে লিখছেন, 'আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ'। এই পত্র-কবিতাটির বিষয়বস্তু কবির ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার বিষয় হলেও সর্বজনীন আবেদন থাকায় তা ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির কাছে পৌঁছাতে দেরী হয়নি। কবিতাটির মূল সুর এই দুটি পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে —

"আয় মোরা যাত্রা করি জগতের কাজে,
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।" [২২]

'পত্র' ও 'শ্রাবণের পত্র' এই দু'টি পত্রকবিতা 'মানসী' (১২৯৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত । দুই পত্র কবিতাই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০ - ১৯০৮)-কে লেখা । প্রথমটি 'বাসস্থান পরিবর্তন - উপলক্ষে' বৈশাখ (১৮৮৭)-এ রচিত এবং দ্বিতীয়টি শ্রাবণে (১৮৮৭) । হালকা চাল হলেও এই পত্র কবিতার বিষয়বস্তুতে কবিমনের অহেতুক বিরহ বেদনা প্রকাশিত ---

"পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ —
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন ।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায় ।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায় ।"

'শ্রাবণের পত্র' কৌতুক রসের পত্র-কবিতা — হাসি - রঙ্গ-রসে ভরপুর । বর্ষায় একাকীত্ব কবির কাছে অসহ্য, তাই রসিকতা করে লিখছেন —

"অতএব ত্বরা করে উত্তর লিখিবে মোরে
সর্বদা নিকটে মোরে কাল সে করাল —
(সুখী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিও ক্ষীর)
এ তত্ত্ব এ চিঠির জানিও moral " ২৪

'শিলঙের চিঠি' ও 'চিঠি', কবিতা দু'টি পত্রাকারে লেখা "পূরবী" (১৩১২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত । ১৩৩৩ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ, জিৎভূমি শিলং থেকে কবি দু'টি বালিকার (শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী, কল্যাণীয়াসু) অনুরোধে 'শিলঙের চিঠি' এইভাবে শুরু করেন —

"ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে ।

তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ - অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস ।" [২৫]

পত্র কবিতাটিতে কৌতুকের ঝিলিক আছে, আর আছে শিলঙের সুন্দর বর্ণনা । কিন্তু কবি পত্রাকারে ছন্দে চিঠি লিখছেন এই জন্য যে, "তোমরা দু'জন বয়েসেতে ছোটই হবে বোধ করি ।" তাছাড়া, কবি আরো বলছেন —" মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয়নি কলম কম্পিত । কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত ॥ এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে । মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসাও ॥" [২৬] 'চিঠি' পত্র কবিতাটি কবি বুয়েনোস এয়ারিস থেকে ১৯২৪ সনের ২০শে ডিসেম্বর ভাই-পো, রবীন্দ্র সংগীতের ভান্ডারী 'শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু'-কে পাঠান । কাকা-ভাইপো-র সম্পর্কটি বড়ই মধুর — তাই কবি কৌতুকরস মিশিয়ে এই serious কবিতাটি লিখেছিলেন, যাতে রয়েছে, "মেশীন - গান -এর সম্মুখে গাই জুঁইফুলের এই গান" । বাংলাদেশের উপর বৃটিশ-শাসকদের চন্ডনীতির বিরুদ্ধে অকুতোভয় বাঙালীর জয়গান গেয়েছেন কবি ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে বালিকা ইন্দিরা তখন কবির কাছে নাসিকে — এবং বালক-পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মায়ের কাছে কলকাতায় । সেখান থেকে কবি ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে কলকাতায় আধো বাংলা ও ভাঙা হিন্দী ভাষায় হাস্য-কৌতুকে ভরা 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র' ('প্রবাসিনী') কবিতা পত্রটি লেখেন, বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা যার ছত্রে ছত্রে প্রবহমান । ইংরেজীশব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন কবি চিঠিটি সরসতায় ভরিয়ে তোলার জন্য । কবিতা পত্রটির শেষের দিকের একটু উদ্ধৃতি, সেখানে কবি খুব মজা করে লিখছেন—

"গাড়ি চড়্‌কে লাটিন পড়্‌কে তুম্ তো যাতা ইস্কুল্,
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হমরা বহুৎ মুস্কিল ।
এদিকে আবার party হোতা খেলনেকোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিম্‌ঝিম্ এবং খোড়া বিস্কুট খাতা ।
তুম ছাড়া কোই সমুজে না তো হমরা দুরাবস্থা,
বখিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌খিল্ কর্‌কে হাস্তা ।

চিঠি লিখিও যাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম ।" [২৭]

এ সব ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য যে সব পত্র-কবিতা রয়েছে, বাহুল্য মনে করে তাদের আলোচনা না করে, তাদের একটা তালিকা প্রদত্ত হল —

কাব্যগ্রন্থ	প্রকাশ কাল	কবিতার নাম	যাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা	স্থান	তারিখ
কণিকা	১৩০৭	উৎসর্গপত্র	শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত	-	-
খেয়া	১৩১৩	ঐ	বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	কলকাতা	১৮ আষাঢ়, ১৩১৩
বলাকা	১৩২৩	ঐ	উইলি পিয়ারসন	তোসামারু জাহাজ	৭ মে, ১৯১৬
বনবাণী	১৩৩৮	জগদীশচন্দ্র	জগদীশচন্দ্র বসু	-	-
পুনশ্চ	১৩৩২	খ্যাতি	— —	-	-
পত্রপুট	১৩৪৩	২ সংখ্যক কবিতা	শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ। কল্যাণীয়েষু	-	১৫.১০।৩৫
শ্যামলী	১৩৪৩	উৎসর্গপত্র	'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে'	-	১লা ভাদ্র, ১৩৪৩
খাপছাড়া	১৩৪৩	ঐ	রাজশেখর বসু	-	৩রা ভাদ্র, ১৩৪৩
সেঁজুতি	১৩৪৫	ঐ	ডাক্তার নীলরতন সরকার	-	১লা শ্রাবণ, ১৩৪৫
ঐ	১৩৪৫	পত্রোত্তর	অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	-	১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫
প্রহাসিনী	১৩৪৫	আধুনিকা	কোন এক আধুনিকার চিঠির উত্তরে	-	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫
ঐ	ঐ	নারীপ্রগতি	রাণী মহলানবীশকে	-	-
ঐ	ঐ	পরচিকানি	অপরাজিতা দেবী ওরফে রাধারাণী দেবী ।	-	৫ আষাঢ়, ১৩৪৫

কাব্যগ্রন্থ	প্রকাশ কাল	কবিতার নাম	যাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা	স্থান	তারিখ
পুনশ্চ/প্রহাসিনী	১৩৪৫	পত্রদূতী	অপরাজিতা দেবী ওরফে রাধারাণী দেবী ।	-	৫ আষাঢ়, ১৩৪৫
ঐ	ঐ	পলাতকা	পুপু ওরফে নন্দিনীকে	-	-
ঐ	ঐ	কাপুরুষ	'অধ্যাপকিনিমু' ওরফে রাণী মহলানবীশ	-	-
ঐ	ঐ	পত্র	জনৈক কাশীবাসীকে	-	-
ঐ	ঐ	মিষ্টান্বিতা	পারুল দেবীকে	-	১লা জুন, ১৯৩৫
* শেষ সপ্তক	১৩৪৮	কবিতাসংখ্যা-১৫	রাণী মহলানবীশকে লেখা চিঠি	-	৬।১৩ অক্টো., ১৯৩৫
ঐ	ঐ	কবিতাসংখ্যা-১৬	সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠি	-	৭ এপ্রিল, ১৯৩৪
ঐ	ঐ	কবিতাসংখ্যা-১৭	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি	-	-
ঐ	ঐ	কবিতাসংখ্যা-১৮	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা পত্র	-	-
ঐ	ঐ	কবিতাসংখ্যা-৪২	ঐ	-	-
ঐ	ঐ	কবিতাসংখ্যা-৪৩	অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্র	-	২৫শে বৈশাখ, ১৩৪২
ঐ	ঐ	কবিতাসংখ্যা-৪৫	প্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখা পত্র	-	-

* পূর্বে লেখা পত্রকে গদ্যছন্দে পত্র-কবিতায় রূপান্তর করা ।

এবার এই পত্র-কবিতাগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে নির্মল কৌতুক রসসৃষ্টি করার প্রতিই কবির বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গ-রস, হাস্য-কৌতুক, মজা ও দুষ্টুমী ইত্যাদির প্রাচুর্য থাকলেও বিদ্রূপ কশাঘাত ইত্যাদি সব সময়েই অনুপস্থিত। হালকা ও সহজভাবকে পত্র-কবিতাতে সন্নিবেশ করা হয়েছে — পাঠককে আনন্দদান, ও রসসিক্ত করাই তার আসল উদ্দেশ্য। আর এটা সম্ভব হয়েছে বিষয়বস্তু এবং তার প্রকাশে সরল সুন্দর ভাষার ব্যবহার ও শব্দ প্রয়োগে। শব্দ প্রয়োগের কোন বাছবিচার নেই — যেখানে যেমনটি প্রয়োগ করা দরকার তেমনটিই করা হয়েছে। সেখানে হিন্দী ও ইংরেজি শব্দও বাদ যায় নি। পত্র কবিতাগুলির ছন্দও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ছন্দের অনুপ্রাস ও শ্বাসাঘাতের জন্য ছড়ার ছন্দ আমাদের মনকে সবচেয়ে দোলা দেয়। সেই ছড়ার ছন্দেই কবি সবচেয়ে বেশি পত্র-কবিতা রচনা করেছেন। এই কবিতাগুলি কবি যাঁদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কবির মধুর আত্মিক সম্পর্ক, বয়সের বাধায় যা সীমাবদ্ধ নয় বরং যা হাস্য-পরিহাস রঙ্গ-রসের সীমায় বদ্ধ — তাঁদের মধ্যে রয়েছে — ভাইপো, ভাইঝি, নাতনি এবং নাতনিস্থানীয়ারা। তাই কবি কখনো এই সব পত্র-কবিতায় হাসির ফোয়ারা যেমন ছুটিয়েছেন তেমনি বাৎসল্যরসের উৎসারণও ঘটিয়েছেন। আবার বন্ধুস্থানীয় যাঁরা তাঁদের কাছে পত্র-কবিতা রচনায় কবি প্রীতি ও পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ফাঁকে ফাঁকে খোঁচা দেবার মতো তিনি নানা তত্ত্ব ও তথ্যের যোগান দিতেন। সহজ আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে কবি নানা বিষয়ের অবতারণাও করতেন, যেমন, বর্ষার সৌন্দর্য, কাব্যচর্চা, বাস্তব নানা সমস্যা, কালিদাসের কাব্যের বিরহ-বেদনা ইত্যাদি। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে দু'একটি কবিতায়। সেখানে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রেম এবং সংগীততত্ত্বের মতো নানা জটিল বিষয়ের উপস্থিতি ঘটেছে। তবে এই সব বিষয়ের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পত্রের কৌতুকরস কোন পত্র-কবিতাতেই অনুপস্থিত নয়।

প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধনের ঘেরাটোপে প্রবন্ধকে আঁটোসাঁটো করতে গেলে প্রবন্ধের স্বচ্ছন্দতা ও সরসতা অনেক সময়েই একটা কৃত্রিম কাঠিন্যের আস্তরণে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এই বাধা ভেদ করে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে সাধারণ পাঠকদের প্রায়ই অনীহা। তাই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পাঠকের মনে যাতে সহজগ্রাহ্য ও রসবেদ্য হয়ে ওঠে সেই জন্য আঙ্গিকের দিক থেকে সহজ সুন্দর উপস্থাপনায় লেখক প্রবন্ধের বিশেষ ছদ্ম আবরণ গ্রহণে

প্রয়াসী হন । এই ছদ্মবেশ, রূপক, পত্ররচনারীতি ও ডায়েরি ইত্যাদি প্রকরণ আশ্রয়ী হয়ে থাকে । এই প্রকরণ একদিকে পাঠকের মনোরঞ্জন ও চমৎকারিত্ব বিধান করে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ পাঠের অনীহাকেও দূর করে দেয় । বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০ - ১৮৮৬) -এর লেখা 'স্বপ্নদর্শন বিদ্যাবিষয়ক' ও 'স্বপ্নদর্শন কীর্তিবিষয়ক' ইত্যাদি রূপকাশ্রয়ী প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য । পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য প্রবন্ধের শক্ত ও জটিল বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । তাই তাঁকেও রসিক, নেশাখোর, কমলাকান্ত শর্মার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল (পূর্বে আলোচিত) । পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে লেখকের একটা ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার ভাব গড়ে ওঠে । পাঠক প্রাবন্ধিকের আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে যায় — তখন সেখানে প্রাবন্ধিকের সততা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে পাঠকের মনে বিরূপ কোন প্রশ্ন থাকে না । তাই পত্র প্রবন্ধ সহজেই পাঠকের মনোহরণ করে থাকে । প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের প্রশ্নও তার মনে স্থান পায় না ।

শেষ বয়সের পত্র প্রবন্ধ রচনার কারণ নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ —

> "প্রবন্ধ লেখার বয়স গেছে । ..... প্রবন্ধ আপন ভার এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্তাতেই চলতে পারে না ; চিঠি চলে যায় পিচ — বাঁধানো রাস্তায় বাইসিকলের মতো । চিঠির সেই হালকা রাস্তায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক ।"[২৮]

'গদ্য প্রবন্ধের ভার বইতে মন একেবারে নারাজ' বৃদ্ধ বয়সে কবির এই উক্তি । পত্র কি করে প্রবন্ধের রূপ পায়, আবার সে লেখার রাশ টেনে না ধরলে প্রবন্ধের রূপও যে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে তার ইঙ্গিতও কবি দিচ্ছেন —

> "চিঠি লিখতেই বসেছিলুম, কিন্তু ঝরণা হয়ে গেল নদী । মাথার মধ্যে অনেক কথাই বরফের মতো অচল হয়ে জমে থাকে, হঠাৎ সূর্যের তাপে একবার যদি গলতে শুরু করে, তা হোলেই বন্যা নাবে, এই চিঠিটা সেই রকমের একটা আকস্মিক উৎপাত । এই বেলা যদি বাঁধ না বাঁধি তা হলে প্রবন্ধের ভদ্রসীমাও টিকবে না ।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর নানান দিক। দীর্ঘজীবনের যাত্রাপথে কবির মনে, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছে এগুলিতে তারই স্বাক্ষর।

মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের বাসা পুণায় অবস্থান কালে, মহারাষ্ট্রে 'বিখ্যাত বিদুষী রমাবাই' (১৮৫৮ - ১৯২২) -এর বক্তৃতা শুনে এসে রবীন্দ্রনাথ 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে | পত্র' (১২৯৬, জ্যৈষ্ঠ) পত্র প্রবন্ধটি রচনা করেন। 'মেয়েরা সকল বিষয়েই পুরুষদের সমকক্ষ' রমা বাইয়ের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি - তর্কের দ্বারা বিচার বিবেচনা করেছেন এই প্রবন্ধে। পত্রের লঘু কৌতুক দিক এবং ব্যঙ্গের সঙ্গে শাণিত ভাষায় কশাঘাত এখানে অনুপস্থিত নয়। কবি লিখেছেন —

> "রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্ষির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না। ....
>
> "স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীর পুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তারা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন; তর্জন গর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন।"[৩০]

খোলা চিঠি 'বাতায়নিকের পত্র' (আষাঢ়, ১৩১৬) রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক পত্র প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি রচনায় বিষয়ে, প্রথম অংশে কবি যা বলেছেন তা শুধুমাত্র চিঠিরই বিষয় —

> "দোতলার ঘরের পুব দিকের প্রান্তে খোলা জানালার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। ...
>
> "যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। ..... আবার একটা কথা এই যে, আমার এই নিখর-চার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাত হাল্কা হওয়া উচিত — লেখনীর পক্ষে এই হাল্কা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না। কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।"[৩১]

বাতায়ন পিয়াসী কবিমনের ভ্রমণবৃত্তান্ত এই পত্র প্রবন্ধ। কবি পত্রের তৃতীয় অংশের প্রথমেই আরও লিখছেন — "অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে ? সেটা কেবল এই বাতায়ন টুকুতে।"[৩২] কবি সমস্ত সংসার থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে, তবেই তার সমালোচনায় মুখর হতে পেরেছেন। পাশ্চাত্য জাতির উদ্ধত চণ্ডনীতি এবং দুর্নীতিজাত রাজনীতি এই প্রবন্ধের পশ্চাৎপটে বর্তমান। আত্মশক্তির দ্বারাই একমাত্র পশুশক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এবং তা একমাত্র কঠিন সাধনার দ্বারাই লভ্য।

'হিন্দু-মুসলমান', (শ্রাবণ ১৩২৯) এই রাজনৈতিক পত্র-প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতন থেকে কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় (১৯২২) মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)-র বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের পথ প্রশস্ত কিন্তু ইংরেজগণই তাতে বাগড়া দিচ্ছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল অন্য রকম — তিনি মনে করতেন ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলন বন্ধ্যার সন্তান ধারণের মতো। কারণ তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন —

> "ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল। আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল, এক পক্ষের যে দিকে খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ।"[৩৩]

তবে মিলনটা সম্ভব তখনই, তিনি বলছেন —

> "মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। .... হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।"[৩৪]

পত্র প্রবন্ধটির প্রথম পরিচ্ছেদে পত্রের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্তমান। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে প্রবন্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রূপদান করে, ইতি টেনেছেন কবি।

'মেয়েদের সম্বন্ধে' রবীন্দ্রনাথ একটি রচনা পড়ে 'যে বিষয় নিয়ে আলোচনা' লেখিকা করেছেন 'সে সম্বন্ধে কিছু' বক্তব্য "নারীর মনুষ্যত্ব" (১৫ বৈশাখ, ১৩৩৫) এই পত্র প্রবন্ধটিতে প্রকাশ করেছেন। নারী পুরুষের যে ভেদ, এটা প্রাকৃতিক কারণেই,

তিনি বলছেন —

> "এটা জানা কথা যে বৈষম্যে শক্তিকে জাগরূক করে, সাম্যে জানে তার নিষ্ক্রিয়তা। শাস্ত্রে বলে সত্ত্ব, রজ, তমর ভেদ মিটলে ঘটে প্রলয়। জীবলোকে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ঘটিয়ে প্রাণ শক্তির বেগ প্রবল করেছে, যদি যুগান্তরকালে একাকারত্ব ঘটে তবে প্রাণের তেজ ম্লান হবে।" ৩৫

চিঠি শেষ করার মুখে, লেখাটা যে আর চিঠিতে সীমাবদ্ধ থাকছে না, সেটা যে প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে, রূপকল্প (form) সচেতন কবি সেটা উপলব্ধি করেই উপসংহার টানছেন এই বলে —"এই বেলা যদি বাঁধ না বাঁধি তা হলে প্রবন্ধের ভদ্রসীমাও টিকবে না।" ৩৬

"সাধনা" (প্রথম প্রকাশ - ১২৯৮) পত্রিকা সম্পাদনার কালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে গদ্য রচনায় সমৃদ্ধ করেছিলেন — বিচিত্র সেই রচনার সব ধারা। সাহিত্য সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায়, সাহিত্য বিচার এবং সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে কবির মনের পরিচয় পাওয়া যায় যখন এই সময়ে কবি-বন্ধু লোকেন পালিত সাহিত্যের রস-নিষ্পত্তির নানান দিক নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। উত্তরে সমজদার বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের সত্য, সাহিত্যের ধর্ম, সাহিত্যের লক্ষণ ইত্যাদি কি ধরণের হওয়া উচিত — এই নিয়ে পত্র প্রবন্ধ 'আলোচনা' (ফাল্গুন ১২৯৯), 'সাহিত্য' (বৈশাখ, ১২৯৯), 'সাহিত্যের প্রাণ' (আষাঢ় ১২৯৮) এবং 'মানব প্রকাশ' (ভাদ্র - আশ্বিন ১২৯৯) ইত্যাদি রচনা করে "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই রচনাগুলিতে, পত্রের আলাপচারিতার ঢঙে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'আলোচনা' পত্র প্রবন্ধে কবি লিখছেন —

> "মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ।" ৩৭

'সাহিত্য' পত্র প্রবন্ধের আসল কথা "সাহিত্য .... কেবল লেখকের আত্মপ্রকাশ"। ৩৮ "সাহিত্যের প্রাণ" ও 'মানব প্রকাশ" প্রবন্ধের মূল কথা —".... সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ"। ৩৯

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থরচনায় ভরা যে সব পত্র প্রবন্ধ রয়েছে, বাহুল্য মনে করে তাদের আলোচনা না করে, একটা তালিকা দেওয়া গেল —

প্রবন্ধের নাম	তারিখ	বিষয়	যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা	গ্রন্থভুক্ত
একখানি চিঠি	আষাঢ় ১৩০২	সাহিত্য		সাহিত্যের পথে
রামমোহনের কথা	আষাঢ় ১৩৩৩	সামাজিক	প্রমথ চৌধুরী	কালান্তর
কংগ্রেস	২৩.৫.০১	রাজনৈতিক	অমিয় চক্রবর্তী	ঐ
দেশনায়ক	১৯০১	ঐ	সুভাষচন্দ্র বসু	ঐ
সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা	মে, ১৯৪১	ঐ	বুদ্ধদেব বসু	সাহিত্যের স্বরূপ
সাহিত্যের বিচার	১৩৪৭	ঐ	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	ঐ

পত্ররচনারীতিতে যে প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, তাদের আকারটা প্রবন্ধের এবং আত্মাটি পত্রেরই। যে বিস্তারিত সীমায় প্রচলিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য — প্রবন্ধের সেই ব্যাপ্তির বিষয়টিকে কবি রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা সব সময় করেছেন। পত্র প্রবন্ধে তাঁর উক্তি —"এই বেলা যদি না বাঁধ বাঁধি তা হলে প্রবন্ধের ভদ্র সীমাও টিকবে না।" তাই কবির পত্র প্রবন্ধগুলি আকারের দিক থেকে প্রায়ই পত্র ও প্রবন্ধের মাঝামাঝি রূপ নিয়েছে। যদিও এই সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা মুস্কিল, কেননা কোন রচনারই বিস্তৃতি সম্পর্কে শেষ কথাটি বলা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধগুলির আত্মাটি পত্রের বৈশিষ্ট্যেই সমুজ্জ্বল। পত্রের বিশিষ্টতায় এগুলি প্রকাশিত। "চিঠি মনের ঠিক যে জায়গাটিতে দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জায়গায়

কখনো পৌঁছাতে পারে না" বলে রবীন্দ্রনাথ আপন-মনের আসল কথাটি প্রচলিত প্রবন্ধে রূপ না দিয়ে পত্রের আঙ্গিকে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াসী হয়েছেন। লেখকের মনকে পত্র-গ্রহীতার অনুবর্তী হয়ে পত্রের যে প্রধান রস, 'তথ্য জগতের সংবাদ' দান, তা-ই আলাপচারিতা ও কথোপকথনে প্রত্যক্ষ আনন্দের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন পত্র-প্রাবন্ধিক কবি। পত্রের মধ্যকার 'বেগটি', পত্র-প্রবন্ধের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তাই প্রবন্ধের ভার লঘু হয়ে 'সহজের রস' জোগান দিতে কোন অসুবিধাই হয়নি রবীন্দ্রনাথের। সব সময় গুরুগম্ভীর নয়, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, মনের হাল্কা চালে কবি তাঁর পত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁর উক্তি —"দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে বাঁচি" কিম্বা, "উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতি" ইত্যাদি। প্রবন্ধের প্রশস্ত-কঠিন পথে নয় — পত্রের আবেগ অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ গলি-ঘুঁজির পথেই কবি তাঁর হৃদয়-উপলব্ধ পত্র-প্রবন্ধের বিষয় সামগ্রিকভাবে পাঠকের হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। আঙ্গিকের আকার ও প্রকারের উপর যে সহজ দাবি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্র-প্রবন্ধে কখনোই তা লঙ্ঘন করতে চাননি — তাই তাঁর রচনা কৃত্রিমতার শিকার হয়ে ওঠেনি। বরং পত্র-প্রবন্ধের 'সহজ রস'- রূপী প্রাণ ভ্রমরাকে তিনি আনন্দের স্বচ্ছন্দ গতিতে গুঞ্জরিত হতে সুযোগ দিয়েছেন পত্রপ্রবন্ধ থেকে পত্রপ্রবন্ধান্তরে।

'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' — সেই শৈশব থেকেই 'সুদূরের পিয়াসী' কবি সারা জীবন ধরে পায়ে যেন চাকা লাগিয়েই আছেন। বিশ্বযাত্রী হয়েছেন তিনি বার বার। 'আমার পথ চলাতেই আনন্দ' — এই আনন্দের খোঁজে কবি বহুবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন — সে স্বদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অথবা বিদেশের পথে পথে। বালক বয়সেই পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭ - ১৯০৫) সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছেন। এই ভ্রমণ কবির জীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছিল তা আমরা কবির 'জীবনস্মৃতি' পাঠে জানতে পারি। এক স্থানে তিনি বেশি দিন থাকতেও চাইতেন না।[৪০] যুবা বয়স থেকে দেখা যায় বিদেশ ভ্রমণ চলেছে একেবারে শেষ বয়স পর্যন্ত (১৮৭৮ - ১৯৩২) এবং ভ্রমণের নানা বিবরণ তিনি ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি পত্রাকারেও ভ্রমণকাহিনী কিছু লিখেছেন, সেগুলি হল —"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" (১২৮৮), "জাভাযাত্রীর পত্র" (১৩৩৬), "রাশিয়ার চিঠি' (১৩৩৮),

"পথে ও পথের প্রান্তে" (১৩৪৫) ও "পথের সঞ্চয়" (১৩৪৬) ইত্যাদি । আবার ভ্রমণের বৃত্তান্ত কিছু লিখে গেছেন ডায়েরির মধ্যে যেখানে, কবিসত্তা থেকে ব্যক্তিসত্তা বেশি করে উপস্থিত । এবং বলাই বাহুল্য, এগুলি আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত বিষয় ।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিলেত যান শিক্ষার্থী হয়ে । "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" সেই ভ্রমণের বৃত্তান্ত ; তেরোটি পত্রে শেষ হয়েছে । কবি এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় লিখেছেন, —

> "কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত যত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে । .... .. একজন বাঙালি ইংলন্ডে গেলে কিরূপ অবস্থার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায় ।
>
> "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে ।"[৪১]

এই গ্রন্থের ৪র্থ পত্র থেকে একটু পরিচয় নেয়া যেতে পারে, যেখানে ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা কবির মন হরণ করেছে —

> "... গ্ল্যাডস্টোন উঠলেন । ... পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল, সে এমন চমৎকার যে কী বলব । গ্ল্যাডস্টোনের কী এক রকম দৃঢ় স্বরে বলবার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয় ।"[৪২]

দ্বীপময় ভারত অর্থাৎ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে বেরোন । ভ্রমণের সময় যে পত্রগুলি (২১ খানা) তিনি লিখে ভারতে পাঠিয়েছিলেন সেই পত্র সমষ্টি নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'জাভা-যাত্রীর পত্র' (১৯২৯) প্রকাশিত হয় । কবি ২ নং চিঠিতে জানাচ্ছেন —

"জীবন যাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মন আজ যা-তা ভাবনার সময় পেল । তাই ভাবছি, কোন সম্পাদকি বৈঠক স্মরণ করে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখব তোমাকে ।"[৪৩]

চিঠি লেখার আশ্বাস থাকলেও এই ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থের পত্রগুলি প্রবন্ধেরই রূপ পেয়েছে। উপরোক্ত পত্রেরই একটি অংশে কবি খাঁটি সাহিত্যতত্ত্ব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন —

"সৃষ্টি করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে বিধান করায় চিন্তা আছে । যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্তার এলাকায়, সেটা কেবল আপন-মনে । যদি কোন হিসেবি লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে 'কেন সৃষ্টি করা হল' তিনি জবাব দেন, 'আমার খুশি' । সেই খুশিটাই নানা রঙে নানা রসে আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে । পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি কেন হলে' সে বলে, 'আমি হবার জন্যই হলুম ।' খাঁটি সাহিত্যেরও এই একটি মাত্র জবাব ।"[৪৪]

১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ পক্কালের জন্য রাশিয়া ভ্রমণে যান । রাশিয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বলিত চৌদ্দ খানা চিঠি এবং একটি উপসংহার রচনা করে তিনি ভারতে পাঠান ; এদের সংকলন গ্রন্থ "রাশিয়ার চিঠি" । চিঠিগুলিতে কবির বস্তুনিষ্ঠ বিষয়মুখীনতার পরিচয় সুস্পষ্ট । রাশিয়ার সংস্কৃতি-সভ্যতার নানান দিক এবং সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, কৃষি ও কারিগরী বিদ্যার দিক নিয়েও প্রবন্ধধর্মী আলোচনা করেছেন তিনি । বিষয়ের গাম্ভীর্য থাকলেও, আলোচনাগুলি পত্রের রচনারীতিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ।

"..... এদের (রাশিয়ানদের) প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে । এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে । পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম । ..... অর্থসম্বল এদের সামান্য"।[৪৫]

শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা (১৯২৬, ২৬শে নভেম্বর থেকে ১লা কিংবা ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫-এর মধ্যে) রবীন্দ্রনাথের ষাটখানি পত্রের সংকলন গ্রন্থ 'পথে ও পথের প্রান্তে', নামক ভ্রমণ কাহিনী । যদিও পত্রের সংকলন তবু পত্রের পত্রত্ব ছাড়িয়ে

এই রচনাগুলি বিষয়ান্তরে সোচ্চার হওয়ায় পত্র প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ প্রায়ই করে ফেলেছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি তারই ইঙ্গিত রেখেছেন এবং গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পাঠকদের সচেতন করেছেন —

> "আমার মতো যাদের রচনায় যৌতাত তারা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে। অবশেষে মনটা এমন অবস্থায় এসে ঠেকে যখন উদ্বৃত্তের উদ্বেলতা তটসীমার নিচে তলিয়ে যায়, জীবন-নদীতে চলার ধারায় চলার কল্লোল মরে আসে। আজ কাছে এসেছে আমার সেই ধ্বনিহীনতার বয়েস, স্বেচ্ছারচিত চিঠি লেখার দিন গেছে পেরিয়ে। ...
>
> ".... কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।"[৪৬]

ভ্রমণকাহিনী বলতে যা বোঝায় "পথের সঞ্চয়" সেই হিসেবে তা নয় — কারণ পত্র নামে যা আছে তা নামেই, আসলে তা প্রবন্ধ। পত্রের বৈশিষ্ট্য ও ভ্রমণ কাহিনীর বৃত্তান্তের ভ্রমনত্ব — এই দু'য়েরই অভাব থাকায় এই গ্রন্থকে আলোচনার বাইরে রাখা হল।

প্রবন্ধের বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে চিঠিপত্রের আঙ্গিকে উপস্থাপিত করে রবীন্দ্রনাথ, "অতীত ও বর্তমান, প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে আপাত-বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য স্থাপন প্রয়াসে"[৪৭] যে নয়টি নিবন্ধ রচনা করেন, সেগুলি পুস্তকাকারে "চিঠিপত্র" নামে ১৮৮৭ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। নতুন ও পুরাতনের সম্পর্ক নিয়ে কল্পিত নাতি নবীনকিশোর দেবশর্মণ ও ঠাকুরদা ষষ্ঠীচরণ শর্মণের মধ্যে 'শ্রীচরণকমলযুগলেষু' ও 'চিরঞ্জীবেষু' নামে পত্র-চালাচালির মধ্য দিয়ে যে উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের ঝড় বয়ে গেছে তা বাংলাসাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি বলা যায়। সত্যনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক ও কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রগুলি রচনা করায় কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন নি। কেননা তাঁর মতে দু পক্ষের ক্ষেত্রে

"প্রতিপক্ষের যুক্তির সুষ্ঠু সমালোচনার দ্বারা নিজ পক্ষের মত প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৪৮] এই গ্রন্থটির আঙ্গিক সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ —

> "যুরোপপ্রবাসীর পত্রে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা থাকলেও কয়েকটি বাদে সেগুলি ব্যক্তি-বিশেষকেই লেখা, সুতরাং পত্রেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু এখানে পরিকল্পনাটি ভিন্নতর। পত্রের ছদ্মবেশে একই বিষয়ের উপর দুটি বিপরীত কোণ থেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত আলোকপাত করে বক্তব্যকে সরস ও উজ্জ্বল করার প্রয়াসটি লক্ষণীয়।"[৪৮ক]

পত্ররচনারীতির সার্থক রূপায়ণ এই প্রবন্ধগুলির ক্ষেত্রে ঘটেছে।

আগেও বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ পত্ররচনারীতিতে কোন উপন্যাস রচনা করেন নি। তবে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি এই রীতি গ্রহণ করেছেন মাত্র একটি গল্পে। 'সবুজ পত্র' (প্রথম প্রকাশ ১৩২৪) - এর জন্য যেসব ছোট-গল্প কবি রচনা করেন —'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ ১৩২১) গল্পটি তাদের অন্যতম। 'সবুজপত্রের যুগে কবির সব ধরণের সাহিত্য রচনাতেই একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুনত্ব এসেছিল, যেমন বিষয়বস্তু নির্বাচনে, আঙ্গিক প্রকরণে এবং ভাষা ব্যবহারে। 'স্ত্রীর পত্রে'ও এই সব বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক ধারার অনুসরণ করেন নি। হিন্দু সমাজের পুরাণো জীর্ণ সংস্কারকে অস্বীকারের মধ্যে যে বিদ্রোহী মনোভাব স্পষ্ট, তাকে কেন্দ্র করেই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কাহিনী প্রতিষ্ঠিত। আবার এটি পত্র রচনারীতির আঙ্গিকে লিখিত। এই গল্পের আধুনিকা বিদ্রোহিনী নায়িকা মৃণাল, সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই বলছে —

> "তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর (বিন্দু) জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান — সেখানে বিন্দু কেবল হিন্দুঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত আপন স্বামীর পরিচিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।"[৪৯]

রচনা কৌশলের দিক থেকে, ছোট-গল্পটি পত্রাকারে রচিত হয়েছে যথার্থ কারণেই।

গৃহত্যাগিনী মৃণাল, সমাজ সংসারে যে নারী নির্যাতনের বুকফাটা কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি এতো দিন — তাই বিদেশে এসে পাগলাঝোরার মতো উদ্দাম মনোভঙ্গী নিয়ে চিঠির মাধ্যমে একান্ত আপন নিজের স্বামীর কাছে অকপটে বলতে চেষ্টা করেছে । পত্র-মাধ্যম ছাড়া মৃণালের এমন অনায়াসে অন্তর্গত কথা ভাবনা চিন্তা রূপ পেতো কি-না সন্দেহ । পত্রের আঙ্গিক সেই দিক থেকে এই গল্পরচনায় সার্থক । কথা সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই গল্পটি রচনার ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেন । পত্র-আঙ্গিকে অপরিহার্য স্বাভিপ্রায় চলিত ভাষার ব্যবহার — এই গল্পে যে সুপ্রযুক্ত ও সফল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । পত্রাকারে এই গল্পটির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অপরিসীম । যে সব ঔপন্যাসিক পরবর্তীকালে পত্রোপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁদের মানসলোকে এই গল্পটির প্রেরণা বিশেষভাবে কাজ করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস । [illegible] উক্ত আলোচনায়, দেখা গেল নানা ধরণের সাহিত্য-শাখায় বিভিন্ন সাহিত্যিক পত্রাকারে তাঁদের রচনাকে উপস্থাপিত করে, সে সময়ে বা তার পরবর্তীকালে পত্রাকারে কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত করে গেছেন । যার ফলে পত্রোপন্যাস রচনায় কোন বাধা-বন্ধকতা বাংলা সাহিত্যে আর ছিল না ॥

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. সমালোচকের মন্তব্য —" এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই ।"

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১১ - ১২ ।

২. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী – বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল — ধনপতি উপাখ্যান বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ; কলি., বিশ্ব.(১৯৬৬), পৃ: ৭৪

৩. তদেব ; পৃ: ২৩৩

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ –বিরচিত / চৈতন্যচরিতামৃত/ লঘু সংস্করণ (১৯৬৩) সুকুমার সেন সম্পাদিত ; সাহিত্য অকাদেমী ; পৃ: ৬০৫ ।

৫. শিবরতন মিত্র সংকলিত Types of Early Bengali Prose, PP: -126-128.

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৫ম খণ্ড (১৯৮৫) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৪৬ থেকে উদ্ধৃত ।

৬. "ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ... পাঁচখানি পত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রীনিবাস আচার্য এবং গোবিন্দদাস কবিরাজকে এই পত্রগুলি লেখা হয় । তাছাড়া 'কর্ণানন্দ' ও 'প্রেমবিলাস' এই সব গ্রন্থের পরিশিষ্টেও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ।"

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫) — বীণা মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ১-২

৭. পুঁথি - পরিচয় (বিশ্বভারতী), ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫ এবং ১৫৭ ; পুঁথি-সংখ্যা ১৫০ ;

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫) — বীণামুখোপাধ্যায়, এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত

৮. বইটির ভূমিকায় লেখকের নিবেদন —" এখন এ স্থানের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজা ক্রিয়াক্ষম হইতে পারে না । ইহাতে তাহাদিগের অকিঞ্চিৎ এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্বাধিক কার্যক্ষমতাসম্পন্ন হয় না এতদর্থে এ ভূমীর যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল ।"

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (১৩৫৬)— সুকুমার সেন ; পৃ: ২৫

৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৫ম খণ্ড (১৯৮৫) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃ: ৮০৪

১০. বাংলা চরিত সাহিত্য (১৯৬৪) — দেবীপদ ভট্টাচার্য ; পৃ: ৬৮

১১. "তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনর্মদনো দিবাপি রাত্রাবপি ।
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্তয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি ॥" — শকুন্তলার পত্র

অভিজ্ঞান শকুন্তলম — তৃতীয় অঙ্ক , পঞ্চদশ শ্লোক

১২. "শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্ ।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং; ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥

শ্রীমদভাগবত, দশম স্কন্ধ, বাহান্ন অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক,
আর্যশাস্ত্র। (৩৭ থেকে ৪৪ শ্লোক সবটাই পত্রবৎ 'গূঢ়সন্দেশ')

১৩. "লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ — | নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তি ক্রিয়তে ।"
— সাহিত্যদর্পনং ॥

১৪. বন্ধুর কাছে লেখা মধুসূদনের পত্রের অংশ —

"I will not allow myself to be bound by the
dicta of Mr. Viswanatha of Sahitya Darpan ".

১৫. বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ) —'লোকরহস্য' – কোন
"স্প্রেশিয়ালের" পত্র — স্বাক্ষরতা প্রকাশন (১৯৭৩), পৃ: ৪৪

১৬. তদেব ; পৃ: ১৬৪

১৭. তদেব ; পৃ: ১৭৭

১৮. সাময়িক পত্র 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ; চৈত্র, ১৩৪৬

১৯. বাংলার পত্র সাহিত্য (১৩৬৩) — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; পৃ: ৭৬

২০. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক (প্রথম খণ্ড) ১৯৭০ — প্রভাতকুমার
মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ২০৩ ।

২১. কড়ি ও কোমল (পত্র) ; র.র., ১।১৬৩

২২. কড়ি ও কোমল (মঙ্গলগীত) র.র. ১।১৬৮

২৩. মানসী (পত্র), র.র., ১।২৪৬

২৪. মানসী (শ্রাবণের পত্র) ; র.র. ১।২৫১

২৫. পূরবী (শিলঙের চিঠি) ; র.র., ২।৬২৪

২৬. তদেব ; র.র., ২।৬২৬

২৭. প্রহাসিনী (নাসিক হইতে খুড়ার পত্র), র.র. ৩।৪০৭

২৮. অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র — প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ । রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (৪র্থ খণ্ড)— ১৩৭১ — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৭৮ থেকে উদ্ধৃত ।

২৯. সমাজ (নারীর মনুষ্যত্ব), র.র. ১৩।২৮ - ২৯

৩০. সমাজ (রমাবাঈয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে—পত্র), র.র. ১৩।১০৫

৩১. কালান্তর (বাতায়নিকের পত্র) র.র., ১৩।২৭১ - ২৭২

৩২. তদেব ; র.র., ১৩।২৭৯

৩৩. কালান্তর (হিন্দু-মুসলমান), র.র., ১৩।৩৫৬ - ৩৫৭

৩৪. তদেব ; র.র. ১৩।৩৫৭ - ৩৫৮

৩৫. সমাজ (নারীর মনুষ্যত্ব), র.র., ১৩।২১

৩৬. তদেব ; র.র. ১৩।২৮

৩৭. সাহিত্য (আলোচনা পত্র) ; র.র., ১৩।৮৩৭

৩৮. সাহিত্য (সাহিত্য— পত্রোত্তর), র.র. ১৩।৮৪১

৩৯. সাহিত্য (সাহিত্যের প্রাণ), র.র. ১৩।৮৪৯

৪০. "... পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায় । আমি হচ্ছি সেই জাতের পাখি । মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে । আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করছি ।"

ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৩৩৬) ; ৫ সংখ্যক পত্রের অংশ— র.র. ১১।২৭০

৪১. য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (প্রথম প্রকাশের ভূমিকা) ; র.র., ১০।২৩১

৪২. য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (চতুর্থ পত্র), র.র. ১০।২৫৫

৪৩. জাভা-যাত্রীর পত্র (দ্বিতীয় পত্র), র.র. ১০।৪০৮

৪৪. তদেব ; র.র. ১০।৪০৯

৪৫. রাশিয়ার চিঠি (চতুর্থ পত্র) ; র.র. ১০।৬৮৮

৪৬. পথে ও পথের প্রান্তে (ভূমিকা) ; র.র., ১০।৮০৬

৪৭. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক (১৩৭৭) — প্রথম খন্ড ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ২২৫

৪৮. তদেব ; পৃঃ ২২৪

৪৮ক. রবি - জীবনী — তৃতীয় খন্ড, ১২১ - ১৩০০ (১৩৯৪) — প্রশান্তকুমার পাল ; পৃঃ ৮

৪৯. গল্পগুচ্ছ (স্ত্রীর পত্র) ; র.র., ৭।৬৪৭

ভূমিকা — ঘ. পরিচ্ছেদ : উনিশ শতকের বাঙালী প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসের আলোচনা —

আধুনিক নাগরিক মূল্যমানস, মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িক পত্রিকা ও পাঠক-সহযোগিতায় উপন্যাসের সূচনা ও উন্মেষ ; 'বাবু'-কেন্দ্রিক বিদ্রূপাত্মক নক্সার সৃষ্টি ; হানা ক্যাথেরীন মুলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ; প্রথম বাংলা উপন্যাস — 'আলালের ঘরের দুলাল' ; নক্সাজাতীয় ব্যঙ্গচিত্র —'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ; ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রোমান্সধর্মী 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ; বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী যথার্থ প্রথম বাংলা উপন্যাস — 'দুর্গেশনন্দিনী' ; প্রতিনিধিস্থানীয় সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস — বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ; রমেশচন্দ্র দত্তের 'সমাজ' ও 'সংসার' ; তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ও 'অদৃষ্ট' ; স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'করুণা' ।

যেমন "সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো"।[১] তেমনি ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য প্রথমার্ধের রচিত সাহিত্যের প্রয়োজন ছিল। প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য অনেকটা কুণ্ঠিত দ্বিধাবিজড়িত, অপরিস্ফুট। ঊনিশ শতকের উপন্যাস বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কে বলেছেন যে বাঙালির আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা ও জীবনসাধনার উদ্বেল তরঙ্গ তখনও সাহিত্য ও জীবনকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন ও সাহিত্য বাঙালির চেতনায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করলে, তার ভঙ্গিমাতে বাংলা সাহিত্য যথাযথ-ভাবে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে চলতে শুরু করে। এই অগ্রগতির পথে মুদ্রাযন্ত্র সেই গতির বেগ অলক্ষ্যে থেকে বিশেষ ভাবে সঞ্চারিত করে। গবেষকের ভাষায় — "আমরা জানি মুদ্রা-যন্ত্র আবিষ্কার ও মুদ্রণ ব্যবস্থার বিস্তার সর্বদেশে পড়ুয়া-জনসাধারণ তৈরী করে"।[২] বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় চেতনার বিপ্লবী মনোভাব (যা রেনেসাঁস বা নব-জাগৃতির ফল) এই শতকের সাহিত্যে বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করে। আবার এরই সঙ্গে চলতে থাকে নতুন-পুরানোর ভাঙা-গড়ার তুমুল দ্বন্দ্ব। এই সময়কার নতুন ভাবে প্রচলিত গদ্য ভাষাই কথাসাহিত্যের প্রকাশে প্রধান হাতিয়ার হল। নতুন করে আয়ত্তে আসা গদ্যকে, পদ্যের মুধা নিয়ে বাঙালি তর্ক-বিতর্ক ও যুক্তি বিচারে ব্যবহার করতে শুরু করলে, তাতে পালিশ পড়ে হয়ে ওঠে সাবলীল ও উন্নত। যুগধর্ম ও সমাজ নিয়ে বাঙালি মনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা হাল্কা চালের তির্যক ভাষায় এই সময়ের সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে রূপ পাচ্ছিল বলে ভাষার স্থবিরত্ব অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছিল। সমালোচকের মতে —

> "…. সে যুগের সংবাদপত্র-পাঠকের একটা প্রধান তৃষ্ণা জন্মেছিল বিচিত্র সংবাদের জন্য। সেই সময়ের সংবাদপত্রে যেসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একাধিক দীর্ঘ চিঠিতে পাওয়া গেছে কোনো না কোনো সংবাদকাহিনী। ….. এই নবজাগ্রত সংবাদ-ক্ষুধা বা তথ্য-ক্ষুধার …. আগ্রহ থেকেই জন্য-লাভ করেছে উপন্যাস পাঠক - জনসাধারণ বা নভেল রিডিং পাবলিক।"[৩]

তাই বলা যায় ঊনিশ শতকের আধুনিক নাগরিক বাঙালি যুগ-মানস বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা। সমালোচকের ভাষায় —"… মুদ্রাযন্ত্র সাময়িকপত্র ও পড়ুয়া-সাধারণ

মিলে উপন্যাসের জন্ম দ্রুততর করে তোলে ।" [৪] ইতিমধ্যে আঠার শতকেই ইংরেজী উপন্যাসের ('পামেলা'— ১৭৪০) সৃষ্টি হয়ে গেছে । উনিশ শতকের এই আত্মসচেতন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী বাঙালি-চিত্তের জাগরণেই বাংলা উপন্যাসের জন্ম বলা যায় ।

প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের মত, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যেও পদ্যভাষায়, নীতি-উপদেশাত্মক কাহিনী, জীবজন্তুর জীবনী সম্বলিত গল্প, ধর্মীয় আখ্যান-কাহিনী, রূপকথা উপকথা ইত্যাদির অলৌকিক রাজ্যের মধ্যে গল্পরস সঞ্চার করে পাঠকদের আনন্দ দানের ব্যবস্থা ছিল । প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের "হিতোপদেশ", "পঞ্চতন্ত্র", "কথাসরিৎ-সাগর", পালি-সাহিত্যের "বৌদ্ধজাতক", "রামায়ণ", "মহাভারত" ও পুরাণের কিছু কাহিনী পাঠককে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে । পদ্যে রচিত, বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়া, মুসলমান কবিদের রোমান্সধর্মী আখ্যান, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ-গীতিকায় ধর্মনিরপেক্ষ বাস্তব মানবজীবন ভিত্তিক প্রেমের কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে । তাছাড়া উনিশ শতকে বিভিন্ন ভাষা থেকে ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে অনেক রোমান্টিক কাহিনী বাংলা গদ্যে রূপ পেয়েছে । পাঠক এসবের খবর রাখত — আরো রাখত 'বটতলা'র[৫] বই-এর ।

আধুনিক কালের সূচনা পর্ব থেকেই বাংলা উপন্যাসেরও সূচনা হয়েছে । জব-চার্নকের কলকাতার নাগরিক সমাজে এক শ্রেণীর বিকৃত রুচির ভোগাসক্ত অসংযমী কালা-পাহাড়ী 'বাবু'র উদ্ভব হয়েছিল । এই 'বাবু'-কেন্দ্রিক কলকাতা সমাজে 'বাবু বিলাস', "বিবিবিলাস', 'দূতীবিলাস' ইত্যাদি নক্সা তৎকালিক সাময়িক পত্রগুলিকে খরশান ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরিয়ে তুলেছিল । বাংলা সাহিত্যে প্রথম গল্পরস সমন্বিত এই বাবু-জাতীয় উপন্যাসধর্মী আখ্যান, 'প্রমথনাথ শর্মা' ওরফে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫ খ্রীঃ) । এই নক্সা জাতীয় বাস্তব 'বাবু' কাহিনীতে, রচয়িতার কল্পনার লেশমাত্র না থাকায়, সৃষ্টিশীল সাহিত্য-রস অনুপস্থিত এবং তাতে সাময়িককালের চলিষ্ণু জীবনের বর্ণনাত্মক ছায়ামাত্রের রূপায়ণ ঘটেছে । ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোন পরিচয় 'বাবু' চরিত্রে নেই । তবে এই যুগ ও জীবনের বিচিত্ররূপকে আশ্রয় করেই পরবর্তী সময়ের সাহিত্যিক সুস্থ-শিল্পসম্মত উপন্যাস সৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়েছেন । সত্যিকারের উপন্যাসদেহ গঠনে এই জাতীয় বিষয়বস্তুকে নীহারিকা-স্তূপ বলা যায় ।

ঊনিশ শতকের উপন্যাস-বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, স্যাটায়ারধর্মী (অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মক) পুস্তিকাগুলিতেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম সূচনা হয়েছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স নাম্নী এক ফরাসী মিশনারী মহিলা 'The Last Day of the Week' - গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" (১৮৫২) রচনা করেন। খৃষ্টধর্মের মহিমা প্রচারে প্রয়াসী হয়ে বাঙালি খৃষ্টান পরিবারের ধারাবাহিকতাহীন কাহিনী ও 'নিতান্ত নির্জীব ও নিষ্প্রভ' স্ত্রী-চরিত্র বর্ণনায় এই বিদেশিনী মহিলা যে সহজ সরল ও সরস বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেই দিক থেকে তিনি প্রশংসার যোগ্য। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচকের মতামত উল্লেখযোগ্য ——

> "ইহার মূল্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে, প্রাণরসোজ্জ্বল জীবনকথারূপে নহে। 'আলালের ঘরের দুলাল' — এ যে অবিরল অসংস্কৃত প্রাণপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার গৌণচরিত্রগুলিও অভিষিক্ত। সুতরাং উপন্যাসের আদি সূচনা 'করুণা ও ফুলমণি' হইলেও, উহার সার্থক পরিণতি-সম্ভাবনাময় আরম্ভ 'আলাল' - এ"। [৬]

বাঙালি সমাজজীবন বিবিক্ত খৃষ্টকথা প্রচারধর্মী রচনা হওয়ায় খৃষ্টান সমাজ ছাড়া এই গ্রন্থের বড় একটা খবর কেউ রাখতেন না। এই গ্রন্থ বাঙালির প্রথম উপন্যাস বলে পরিচিত হবার যোগ্য নয়।

ভবানীচরণের মতো, পরবর্তীকালে ছদ্মনাম গ্রহণ করে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) সেই সময়ের সমাজ ও জীবনকে আশ্রয় করে রস-কৌতুকপূর্ণ নকশাধর্মী রচনা "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮) সৃষ্টি করলেন, যা তাঁর রচনার গুণে যথার্থ উপন্যাসের শিল্পসম্মত রূপকে ত্বরান্বিত করে তুলল। সমালোচকের মতে —

> "প্যারীচাঁদের লেখায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম যে যে বৈশিষ্ট্যের দেখা পাওয়া গেল —
>
> ক) উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এই রচনায়।

খ) একটি বিস্তৃত দেশব্যাপী জীবনপটের, প্রকৃতির এবং মানুষের প্রথম ব্যবহার এখানে পাওয়া গেল ।

গ) ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাসী মনের প্রথম পরিচয় এই রচনায় মিলল ।

ঘ) সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা মানসসৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রথম এই রচনায় লাভ করা গেল ।"[৭]

আদি - মধ্য - অন্ত সমন্বিত একটি কাহিনী এবং চরিত্র নির্মাণে, উপন্যাসধর্মী গঠন-কৌশলের প্রথম প্রয়াস প্যারীচাঁদের রচনায় দেখা গেল । শাসন শৃঙ্খলাহীন বিলাস-ব্যসনপূর্ণ, কলকাতার নাগরিক সমাজের চিত্রই এই রচনার মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হওয়ায় চরিত্র সৃষ্টির দিকে লেখক বেশি দৃষ্টি দিতে পারেন নি । ধনী পিতার আদরের সন্তান অসৎসঙ্গে অধঃপাতে যায় ; অবশেষে মোহভঙ্গে সৎপথে ফিরে আসে, এই কাহিনীই লেখক "আলালের ঘরের দুলাল"-এ তুলে ধরেছেন । চরিত্রগুলি বাস্তবতার অনুসরণ করলেও, একরোখা চরিত্রের (মুন্সী) ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি । উনিশ শতকের উপন্যাস বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের চরিত্রগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, বাবুরাম, মতিলাল ও তার কুসঙ্গীরা, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, এই সমস্ত প্রত্যেক চরিত্র আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ ঠকচাচা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে একটি উজ্জ্বল চরিত্র । এবং রচনাকৌশলের বাস্তবতা ও সজীবতা ঠকচাচার স্বার্থপর ধূর্ত চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম সাধুভাষার বাঁচে প্যারীচাঁদ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন । তার ফলে লেখকের বর্ণনা ও চরিত্র যথেষ্ট সজীব । চরিত্রের সংলাপও নাটকীয় পর্যায়ে পৌঁচেছে । সমালোচকের মন্তব্য — "নরনারীর হৃদয়াকর্ষণই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য — প্রেমই মানবজীবনের সৌরশক্তি । .... বাংলা উপন্যাস্ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ (১৮৫৮ খ্রীঃ) প্রেম নাই, ইহার ঔপন্যাসিক উৎকর্ষও নাই ।"[৮] উপন্যাসটির এমন হবার বোধ হয় কারণও ছিল । উপন্যাস রচনায় আঙ্গিকরীতিতে দ্বিধা এবং ঔপন্যাসিকের সামনে যথার্থ আদর্শ বাংলা উপন্যাস ছিল না । উপন্যাসটি অনেকটা 'জীবনচরিত' রীতির আঙ্গিকে লেখা । এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ বোধ হয় মতিবাবুর জীবনচরিত রচনা করতে চেয়েছিলেন । সেই সময়ে এই ধরণের কাল্পনিক (fictitious) অথচ বিশ্বাস্য (Convincing) জাতীয় জীবনচিত্র' বিভিন্ন সাময়িকপত্রে

প্রকাশিত হয়েছিল । এই সম্পর্কে গবেষকের মতামত ——

> "সাধারণ জীবনচরিতে এক ব্যক্তির জন্ম, বিদ্যাভ্যাস বিবাহ, কর্মজীবন প্রভৃতি যেমন পর পর বর্ণিত হয়ে থাকে, 'আলালের ঘরের দুলালে' অনুরূপ রীতি গৃহীত হয়েছে । ফলে নভেল ও চরিতসাহিত্য উভয়ের কিছুটা মিল ঘটেছে এই পর্যায়ের বইগুলিতে । বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' (১৮৮৩) ব্যঙ্গধর্মী রচনা । .... মনে হয় দীনবন্ধু সৃষ্ট ঘটিরাম ডেপুটির অনুসরণে বঙ্কিম 'মুচিরাম' নাম করেছিলেন ।"[৯]

এই সময়ে 'হুতোম প্যাঁচা' এই ছদ্মনামের আড়ালে থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০ - ৭০) রচনা করলেন ব্যঙ্গচিত্র সমন্বিত যথার্থই নক্সা জাতীয় কাহিনী "হুতোম প্যাঁচার নকসা" (১৮৬২) । লেখকের রচনায় শিল্পরূপের অভাব থাকায়, কিছু নতুন উপাদান, চমৎকৃত করার মত চলিত ভাষার ব্যবহার ইত্যাদিও গ্রন্থটিকে উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি ।

"আলালের ঘরের দুলাল" — এর সমসাময়িক কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭ - ১৮৯৪) রোমান্সধর্মী "ঐতিহাসিক উপন্যাস" (১৮৫৭) রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হয় । এই গ্রন্থের আখ্যান দু'টি ('সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়') ঐতিহাসিক পরিমন্ডলে কাল্পনিক কাহিনী-ভিত্তিক রচনা । ঔপন্যাসিক হিসেবে যতটা সাবলীল ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন, তার সঙ্গে যতটা কাল্পনাশক্তি ও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া দরকার ; লেখকের তার কোনটাই তেমন ছিল না বলে ভাষার প্রসাদগুণের দ্বারা কল্পনার সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের মিলন ঘটিয়ে যে মহৎ শিল্পরূপের ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করা সম্ভব, তা তাঁর দ্বারা হয়ে ওঠেনি । অথচ অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরই খানিকটা প্রভাবে উপন্যাসের যথার্থ 'ভাষাপথ খনন' করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রোমান্স মিশিয়ে, কল্পনাশক্তির মেল বন্ধনে বঙ্কিমচন্দ্র নরনারী চরিত্রের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম ভালোবাসা, ঈর্ষা, সংশয়, উৎকন্ঠা ঘৃণা, আত্মগোপনীয়তা ও গোপনীয়তা ইত্যাদির বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন করলেন যে রচনায়, সে-ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (দুর্গেশনন্দিনী - ১৮৬৫) রূপে পরিগণিত হল ।

রূপে পরিগণিত হল । ?

বাঙালি - সমাজে নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশা ঊনিশ শতকে অকল্পনীয় ছিল । তাই সেই সময়ে সমাজ-জীবনের রূপকার হিসেবে প্রেমের আখ্যানের বাস্তব নিদর্শন ঔপন্যাসিকদের তুলে ধরায় অসুবিধা ছিল । 'প্রেম নাই' বলে, সমালোচকের মন্তব্যে প্যারীচাঁদের 'আলাল' উপন্যাসের পদবাচ্য নয় — উপন্যাসে সেই রোমান্টিক প্রেমের অবতারণা করতে বঙ্কিমকে ইতিহাসের নর-নারীর জীবন - আখ্যান ও রোমান্স সৃষ্টি করতে হয়েছে।[১০] তাঁর উপন্যাসে যে প্রেমের চিত্র আছে তার প্রায় সবই বিবাহিত নারী - পুরুষের । প্রেম করে বিবাহিত জীবনে মিলন বলতে যা আমরা এখন দেখতে অভ্যস্ত — তা সেই সমাজে ছিল না বলে বঙ্কিমের সাহিত্যেও তা অনুপস্থিত ।

ঊনিশ শতকে যখন বাংলা উপন্যাস রচিত হতে শুরু করল তখন কিছু বেশি একশ বছরে অনেক ইংরেজী উপন্যাস রচিত হয়ে গেছে । প্রথম ইংরেজী উপন্যাস পামেলা (১৭৪০) । ইংরেজী উপন্যাস ঊনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছিল । এখনো করছে না তা বলা যায় না । বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা শুরু করেন তখন তাঁর সামনে আদর্শ হিসেবে ছিল ভারতীয় সাহিত্য এবং শেক্সপীয়রের নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও নাটকীয়তা, স্কটের উপন্যাসের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ও রোমান্স এবং ডিকেন্সের উপন্যাসের সামাজিক ও পারিবারিক খুঁটিনাটি সমন্বিত মানবিক বিষয়বস্তু । প্রতিভা স্বীকরণের দ্বারা বঙ্কিম ভারতীয় আদর্শে সম্পূর্ণ মৌলিক বাংলা উপন্যাস রচনা করেন । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বহু ধরণের বিচিত্র কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে । আধুনিককালে যুগের পরিবেশে যেভাবে তারা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে তা সেই যুগে অনুপস্থিত ছিল । আখ্যান ছিল নেহাতই গল্প এবং চরিত্র ছিল এক রঙা । কার্যকারণ সমন্বিত কাল পারম্পর্যের সমাবেশে পরিকল্পিত যে আখ্যান তা-ই উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ প্লট । এই ধরণের প্লট নির্মাণ বাংলা সাহিত্যে কিছুটা প্রথম দেখা দেয় বঙ্কিমের উপন্যাসে। যুগযুধর্ম - সমন্বিত অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্র আধুনিক যুগের জীবন - যন্ত্রণার ফসল । বক্তব্যকে উপস্থাপনের সহায়ক হিসেবে ঔপন্যাসিক এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করেন । এর পিছনে থাকে, ঔপন্যাসিকের সমুন্নত কল্পনাশক্তি ও বাস্তব জ্ঞান - বুদ্ধি । এই শ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে । স্বদেশ ও স্বজাতির

কল্যাণ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা স্বদেশচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল । উপযুক্ত গদ্যভাষা [১১] সৃষ্টি করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আত্মসচেতন বঙ্কিমচন্দ্র, উপন্যাসের বক্তব্য, প্লট ও চরিত্র, জীবনবোধে রূপরসময় করে তুলেছিলেন ।

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ে এখানে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন । ঐতিহাসিক, আধা-ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী ও মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-সম্বলিত সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে শেষোক্ত পর্যায়ের উপন্যাসের সঙ্গে পত্রোপন্যাসের বেশি সাযুজ্য লক্ষ করা যায় । তাই সামাজিক-পারিবারিক প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসই আলোচনার বিবেচ্য মনে করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে । চরিত্রের অন্তর্জগতের কথাসমন্বিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিক্‌কার প্রতিনিধিস্থানীয় সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। পরের পরিচ্ছেদে, আত্মকথনরীতির উপন্যাস হিসেবে 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে পুনরুক্তির আশংকায়, এই পরিচ্ছেদে এদের আলোচনার বাইরে রাখা হলো ।

উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনায় সময় নষ্ট করা যে উচিত নয়, সে সম্পর্কে সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র, 'সীতারাম' উপন্যাসে (তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে) মন্তব্য করেছেন — " উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন — ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন ।" 'অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান' হবার প্রথম যথার্থ প্রমাণ রাখলেন রবীন্দ্রনাথ, 'চোখের বালি' রচনা করে । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'চোখের বালি'র সূচনাংশে —" .... সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো ।" মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সমন্বিত চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয় । তবু বঙ্কিমের উপন্যাসেই প্রথম মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সমন্বিত চরিত্রের উন্মেষ ঘটে ।[১২]

নীতিবাদীর ভূমিকা [১৩] পালন করেও বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ ভাষা ও জীবনদর্শনকে যথাযথ ভাবে শুভচেতনাবোধে ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয়ে 'বিষবৃক্ষে' তুলে ধরেছেন । বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশে বাঙালি নরনারীর পারিবারিক জীবন-দ্বন্দ্ব

এই উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। রূপজমোহ ও জৈব-প্রবৃত্তিই যে নরনারীর জীবনের নিয়ন্তা এবং যথার্থ বিপর্যয়ের মূলে — এই ভাব স্পষ্ট করতে গিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের প্রেমের সম্পর্ককে ঔপন্যাসিক যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রধান কাহিনী (নগেন্দ্র - সূর্যমুখী - কুন্দনন্দিনী), উপ-কাহিনী (দেবেন্দ্র - হীরা - কুন্দ) এবং একটি ছোট উপ - আখ্যানের (শ্রীশ - কমলমণি) অচ্ছেদ্য বাঁধনে উপন্যাসের জটিল কাহিনী গড়া। নগেন্দ্রনাথের অসংযত রূপজমোহ, স্ত্রী সূর্যমুখী ও বিধবা কুন্দনন্দিনীর জীবনে টেনে এনেছে সংঘাত ও বিপর্যয় — পরিণামে বিষ পানে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা। পরে, উপন্যাসের ট্র্যাজিডির মধ্য দিয়ে নগেন্দ্র - সূর্যমুখীর মিলন। এই পরিণতির পিছনে ছিল অবশ্যই উপ - কাহিনীর নায়ক নায়িকা, দেবেন্দ্র - হীরার সক্রিয় ভূমিকা। নগেন্দ্র সূর্য-মুখীর জীবনে বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য আদর্শ - সম্পতি হিসেবে শ্রীশ - কমলমণির জীবন-আলেখ্য সাফল্যের সঙ্গে উপন্যাসে পরিবেশিত। তবে নর-নারীর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক উপন্যাসের ঘটনা বাহুল্য এবং তাড়িৎগতির দরুণ যথাযথভাবে পরিস্ফুটনে সুযোগ পায় নি। একথা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস সম্পর্কেও বলা যায়। [১৪]

হরদেব ঘোষালের কাছে নগেন্দ্রনাথের এবং কমলমণির কাছে সূর্যমুখীর লেখা চিঠিপত্রে নায়ক - নায়িকার চরিত্রের খবর ও মানসিক দ্বন্দ্ব ঔপন্যাসিক সুকৌশলে পাঠকের গোচরে এনেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয় এবং তার প্রায়শ্চিত্ত করার পালা চলে। আবার সূর্য-মুখীর প্রত্যাবর্তনের পরে কুন্দকে পরোক্ষভাবে আত্মঘাতিনী হতে সাহায্য করে সেই পালা নগেন্দ্রনাথের শেষ হয়। নগেন্দ্রনাথের মনের খবর পাওয়া যায় তার কিছু চরিত্রোজ্জ্বলাময় উক্তিতে —

> ক) কুন্দনন্দিনীকে উদ্দেশ করে — (ষোড়শ পরিচ্ছেদ) —"শুন কুন্দ। আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারিনা, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিনা। শুন, কুন্দ। এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে — আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

ধ) সূর্যমুখীকে উদ্দেশ করে বলা (একবিংশ পরিচ্ছেদ) —" আমি এ সংসার ত্যাগ করিব । মরিব না — কিন্তু দেশান্তরে যাইব । বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই । তোমাতে আমার আর সুখ নাই । .... আমি উন্মাদগ্রস্তপ্রায় হইয়াছি — সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব ; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম । যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব । নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ ।"

গ) হরদেব ঘোষালকে লেখা চিঠিতে (দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ) —"সূর্যমুখীকে হারাইলাম । সূর্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ । সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনুর এক জনের কপালেই উঠে । সূর্যমুখী সেই কোহিনুর । কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে ? ....

"আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম ? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম ? ভালবাসিতাম বই কি — তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম — প্রাণ বাহির হইতে ছিল । কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা । নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি — এখনই বলিব কেন, "আমি তাহাকে ভালবাসিতাম ?"

"যাঁরা বঙ্কিমসাহিত্যে অনন্যা" [১৫] । প্রেমের ক্ষেত্রে বিচিত্ররূপের বাস্তব স্বাক্ষর এই নারী চরিত্রে দেখা যায় । ত্রি-চাকর শ্রেণীর চরিত্র যেমন হয়, তেমন করে এই চরিত্রের উন্মোচন বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি । এই চরিত্রটি সৃজনের পিছনে যেমন ছিল তার গভীর সহানুভূতি তেমনি ছিল নারী চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিচিত্র গতির বাস্তবরূপের প্রতি অভি-নিবেশ । যাঁরার দৈহিক রূপগত বর্ণনা, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দান, বংশগত দিক, সৌখিনতা ও চালচলন ইত্যাদিতে তার পরিচয় মেলে । জীবন-মনের দিক থেকে বিধবা যাঁরা অভাব-গ্রস্ত । তার চাহিদা এতোদিন সুপ্ত থাকলেও সূর্যমুখীর সুখের সংসারে কাজে লাগবার পরে তা জেগে উঠে । সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেখে যাঁরার মনে একটা অকারণ জাত-ক্রোধ (ধনীর প্রতি দরিদ্রের) ও ভেদের সৃষ্টি হয় — যা তাকে প্রতিহিংসা-পরায়ণা করে তোলে । সে নিজের মনেই বলে চলে (বিংশ পরিচ্ছেদ) —"আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন ? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই ;

বরং ভালোই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানেনা? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট — সে মুনিব, আমি বাঁদী।" কুন্দের প্রতিও তার রাগ — যদিও কুন্দ এই ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। এই রাগের কারণ, হীরার নিজের প্রণয়াস্পদ দেবেন্দ্রের কুন্দের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ; এবং কুন্দকে করতলগত করার কামনায় কুটনীর ভূমিকায় আবার হীরাকেই তার নিয়োগ করা। এই রাগ দূর করার জন্য হীরা চাইল, এক ঢিলে দুই পাখি মারতে। কুন্দের প্রতি তার রাগ প্রচ্ছন্ন রেখে, তার নিধনের মধ্য দিয়ে, সে চেয়েছিল নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সুখের সংসারে ভাঙন ধরাতে, অন্যদিকে, কুন্দ সম্পর্কে দেবেন্দ্রের অসংযত আশাকে নির্মূল করে দিতে। দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার প্রতিহিংসার আগুন হৃদয়ে জ্বলে উঠলেও সে কিন্তু দেবেন্দ্রকে নিহত করার পরিকল্পনার দিকে গেল না — এই জন্যে যে, যদি কুন্দকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্র ভালবেসে তাকেই আবার কাছে টেনে নেয়, এই একটা ক্ষীণ আশা হীরার মনে খেলা করছিল। বলাবাহুল্য, এই আশা খুবই মনস্তত্ত্ব-সম্মত। প্রতিহিংসা পরায়ণা জটিল চরিত্রের এই হীরার পরিচিতি ঔপন্যাসিক তারই স্বগতোক্তি ও আত্মবিশ্লেষণে পরিস্ফুট করেছেন (বিংশ পরিচ্ছেদ) —

> "মনে করিয়াছিলাম যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভাল-বাসিব না। ... শেষে ... পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল। ... আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে। আর বলতে লোক পেলেন না। মারি মিন্সের নাকে এক কিল। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। .... তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। .... বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। ... আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্য্যমুখীর খোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে।"

হীরা নিজে জ্বলেছে, পরকে জ্বালিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। হীরার যে-প্রেমের মর্যাদা দেয়নি দেবেন্দ্র, সেই প্রেমকেই ভুলতে না পেরে সে তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদিনী হয়েছে। দেবেন্দ্রের শেষ অবস্থায় তাকে দেখতে এসে হীরা তার পূর্ব প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করেছে দেবেন্দ্রেরই গীত সেই পদাবলীর কলি নিজকণ্ঠে গুঞ্জন করে।

পাঠকের কাছে হীরাচরিত্র নাটকীয়, মর্মান্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক ।

> "... এক দুর্নিবার নিয়তির তাড়নায়, ঐ যে এক প্রখর বুদ্ধিমতী, আত্মগোপন-পটু, গভীর হৃদয়া নারী নিজের গোপনতম মর্মস্থল অনাবৃত করিয়া শেষে যেন সর্বস্ব হারাইয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং ধূমোদ্গমনের শিখার মত তাহার কেশপাশ উড়াইয়া নিজেও ধ্বংস হইয়া গেল — নারীর এমন ট্র্যাজিক চরিত্র বঙ্কিম আর কোথাও এমন সহানুভূতিশীল কবিদৃষ্টিসহকারে অঙ্কিত করেন নাই ।"[১৬]

নিষ্পাপ শ্বেতশুভ্র কুন্দকলি, দাম্পত্যজীবনে প্রস্ফুটিত হবার আগেই অকালে ঝরে পড়ল । প্রেমের অমর্যাদায়, বুকভরা অভিমান নিয়ে বিদায় নেবার আগে একবার স্বামী নগেন্দ্রনাথ-কে সোচ্চার হয়ে যে কথাগুলি কুন্দ বলে গেল — তার মধ্যে এই শান্ত - স্নিগ্ধ প্রেমময়ী নারীর আত্মসচেতনতার স্বাক্ষর রয়েছে (ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ) —

> "..... তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ? —

> " ..... কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে — কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে তবে আমি মরিতাম না । আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি — তোমাকে দেখিয়া আমার আজও তৃপ্তি হয় নাই । .....

> "..... ছি ! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না । আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম — তবে আমার মরণেও সুখ নাই ।"

সূর্যমুখীও স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে কুন্দের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করেছে । এই দু'টি নারীই — রমণীরত্ন স্বামীগত প্রাণ এবং পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা হীরার মত প্রবৃত্তিতাড়িত নয়, অথচ অনন্য স্বরতায় ভাস্বর ।

'বিষবৃক্ষে'র মত 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সামাজিক - পারিবারিক উপন্যাস । ঔপন্যাসিকের মূল বক্তব্য-বাঙালির সমাজনীতিতে দাম্পত্যজীবনে তৃতীয় ব্যক্তির

অনুপ্রবেশ দণ্ডনীয় অপরাধ । 'বিষবৃক্ষে'র কাহিনীর সঙ্গে এই উপন্যাসটির কিছুটা মিল লক্ষ করা যায় — উভয় কাহিনীতে রয়েছে ত্রিভুজ প্রেমের জটিলতা, বিবাহিত নায়কের প্রতি বিধবা নারীর প্রণয়ঙ্করী প্রেমের আকর্ষণ বিকর্ষণে তার ভয়ঙ্কর পরিণতি । কিন্তু এই আপাত মিল বাইরের ঘটনাজাত । প্রায় একই ধরণের দুটি কাহিনীর শিল্পরস-পরিণতিতে, যে কত পার্থক্য ঘটতে পারে তার যথার্থ উদাহরণ এই উপন্যাসের বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রগুলি । বিষবৃক্ষে নায়ক-নায়িকার মিলনান্তক সমাপ্তি (যদিও কুন্দের শোকাবহ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে), অন্যদিকে কৃষ্ণকান্তের উইলে বিষাদান্তক পরিণতি । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঘটনাবহুল নাটকীয় কাহিনী ও অন্যান্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টিকারী সাধারণ উপকরণের (যেমন সাধু—সন্ন্যাসী অলৌকিক সংকেত, স্বপ্নদর্শন, জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি) যেন ঝরে গিয়ে এই উপন্যাসে বহুদেশী সরল-প্লট-কেন্দ্রিক আখ্যানের সৃষ্টি হল, তাতে থাকল না অজানিত ঘনীভূত কৌতূহল । সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতি দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে চরিত্রসৃষ্টি-বিষয়ে প্রাধান্য দিতেই হল । 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রে নাটকীয়তার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকলনের যে সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন, তারই পরিণত ও সার্থক রূপ দেখা গেল 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' । 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, ইহা বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।[১৭]

গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী — এই উপন্যাসের তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র । নায়ক, বিবাহিত গোবিন্দলাল, তার স্ত্রী ভ্রমর এবং বিধবা যুবতী সুন্দরী রোহিণী তার প্রেমিকা । রোহিণী চরিত্রের জীবন তৃষ্ণার দিকটি পাঠককে অবহিত করানোর জন্য ঔপন্যাসিক কৌশলে উপন্যাসের প্রথম দিককার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন । উইলের মালিক কৃষ্ণকান্ত, তার পুত্র হরলালের প্রলোভনে পড়ে, বিধবার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সুখকর আনন্দোজ্জ্বল ছবির হাতছানিতে সাড়া দিতে গিয়ে রোহিণী, হরলালের প্ররোচনায় উইল চুরি করতে সাহসী হয় । পরে হরলালের বিয়ের নামে মিথ্যা চাতুরী ধরতে পেরে, হতাশার গ্লানিতে ভেঙে পড়ে রোহিণী উইল সিন্ধুকে ফেরৎ রাখতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় । এতদিনকার নিজের মনের সুপ্ত কামনা-বাসনার কাছেও রোহিণী ধরা পড়ে গেল । জেগে উঠল তার রিপু — হতাশায় তার মনের কথা পুঞ্জরিত হল (১ম খণ্ড/৭প.)–

"..... কি অপরাধে এ বাল্য-বৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল ? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখ-ভোগ করিতে পাইলাম না । কোন দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ? .... ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী — তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী — কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ — আমার কপালে শূন্য ।"

চুরি যাওয়া উইল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গোলমাল শুরু হলে পরিবৃ দুঃখিনী অথচ রূপসী রোহিণীর বিপদে উপচিকীর্ষু নায়ক গোবিন্দলাল সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করল । ঘটনাক্রমে রোহিণীর প্রতি রূপজমোহে আকৃষ্ট গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর প্রণয়ও তার প্রতি গাঢ় হয়ে ওঠে ; ঔপন্যাসিকের মন্তব্য (১।১) — "রোহিণী ... গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল ।" এর পিছনে বঙ্কিমের সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ রাতিভাবের আলম্বন বিভাবরূপে কাজ করে গোবিন্দলাল-রোহিণীর মনে সুধার রসের প্রস্রবণ বইয়ে দেয় । এখান থেকেই চরিত্র-দুটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের আখ্যান পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে আর তার সঙ্গে চলেছে অবৈধ প্রণয় ।

স্বামীনির্ভর ভ্রমর, স্বামী-মোহাগিনী । স্বামীর বিশ্বাসই তার বিশ্বাস । রোহিণীর প্রতি আচরণে গোবিন্দলালের কোন দোষ ছিল না — তা বেশ বুঝতে পেরে ভ্রমরের মনেও তার স্বামীর প্রতি কোন সন্দেহের প্রশ্ন উদয় হয়নি । তাই রোহিণীর বিপদে তার স্বামী যে তাকে সাহায্য করবে, এতে তার মনে কোন ভাবনার অবকাশ ছিল না । এটা গোবিন্দলালও ভাল করে জানত বলে রোহিণী-উদ্ধার-কার্যে সাবধান হবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি । ভেতরে ভেতরে রোহিণীর প্রতি তার রূপ-লালসা কাজ করে চলেছে — তার সঙ্গে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি, যেমন দয়া, মায়া, সমবেদনা ইত্যাদির প্রেরণা তো ছিলই । তাছাড়া যখন রোহিণীর হৃদয় গোবিন্দলালের হৃদয়ের কাছে খুলে গেল — তখন তার "সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, ... উদ্বেলিত হইয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল ।" রোহিণীকে আত্মহত্যার কবল থেকে উদ্ধার করার পরে গোবিন্দলালের মনে তার প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল । ক্রন্দনরত অনুশোচিত গোবিন্দলালের মনের

যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তঃকরণে, রোহিণী বাহিরে। তথাপি ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা— তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।"

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত গোবিন্দলালের হৃদয়ের পরিচয় এই উদ্ধৃতির মধ্যে চমৎকারভাবে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন।

কার্য-কারণ সম্পর্কিত এক একটি ঘটনা উপন্যাসে ঘটেছে – ঔপন্যাসিকও তাদের আশ্রয় করেই নায়ক ও প্রধান নারী দুটির চরিত্র বিকশিত করার চেষ্টা করে গেছেন। ঘটনাগুলির বিস্তারিত বিবরণ নয় — চরিত্রবিকাশে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তিনি সংহত আকারে রূপ দিয়েছেন। বহির্ঘটনাজাত সংঘর্ষে চরিত্রগুলি আলোড়িত হয়েছে, আবার অন্তর জগতের দ্বন্দ্বও সমানভাবে সক্রিয় থেকেছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ বহির্জাত ঘটনার দ্বারা বিশেষ আলোড়িত হয় নি। তার অন্তরের দ্বন্দ্ব যা তার মনকে কুন্দনন্দিনী সম্পর্কে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তা-ই প্রকাশিত হয়েছে হরদেব ঘোষালের কাছে লেখা চিঠিতে। এ দিকে এক একটা ঘটনা ঘটেছে আর গোবিন্দলাল তাতে জড়িয়ে পড়েছে; নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য তার এই দুঃখকর পরিণতির জন্য তার স্ত্রী ভ্রমরকেও খানিকটা দোষী বলা যায়। ভ্রমর অভিমানিনী ছিল। তবে সূর্যমুখীর মত সে গর্বিতা ছিল না। প্রেমের ক্ষেত্রে তার হৃদয়ে বিশ্বাসভঙ্গকারীর কোন স্থান নেই। তাই অভিমানে সে স্বামীর কাছ থেকে সরে যাবার জন্য আত্ম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিল, তবু স্বামীর সঙ্গে কোন আপোষ মীমাংসায় এগিয়ে আসেনি। অভিমানিনী ভ্রমর গভীর দুঃখে 'অবিকম্পিত কণ্ঠে' স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছে —

"তবে যাও — আর, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। — কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও একদিন আমার জন্য কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও — একদিন তুমি খুঁজিবে .... আবার খুঁজিবে — আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে - .... । যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও — দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই — রোহিণীর নও।" (১।৩)

পারেনি । স্রষ্টার মমতা বা করুণা-বারি যখন তার প্রতি কখনোই সিঞ্চিত হয় না তখন অবিচারের প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে । অবিচারের নিদর্শন, ঔপন্যাসিকের রোহিণী সম্পর্কে নির্দয় মনোভাব (১।২২) —

"রোহিণী না পারে এমন কাজ নাই, ইহা অমর পূর্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে ।...

"আমাদের বড় দুঃখ রহিল । ভ্রমর .... রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ । ..... স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি । কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, একথা তত মানি না ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বস্তুর উপস্থাপনা অনেক সময় তাঁর মন্তব্য থেকে স্বতন্ত্র হয় । রোহিণী সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য নীতিক্লিষ্ট, ব্যঙ্গ ও শ্লেষে কণ্টকিত । কিন্তু আবার সেই রোহিণীর রূপায়ণে বঙ্কিমের শিল্পীদৃষ্টি সহিষ্ণু, উদার এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ । জীবনের রূপায়ণ বঙ্কিমের । মন্তব্যও বঙ্কিমের । মন্তব্যকারী বঙ্কিম রূপায়ণকারী বঙ্কিম থেকে আলাদা । মন্তব্য সমালোচকের, সেখানে তাঁর সামাজিক চেতনা প্রবল । রূপায়ণ শিল্পীর, সেখানে তাঁর আর্টের চেতনা প্রধান । আমরা যদি বঙ্কিমের মন্তব্য ধরে ধরে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিশ্লেষণ করি, তবে এ উপন্যাস পাপ-পুণ্যের হিসেব-করে আনানো কাহিনীর সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায় । তখন বলতে হয়, এ জীবনকথা কাল-অতিক্রমী নয় । রোহিণী সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকের জবানী থেকে জানতে পারি —

"পাপ সম্বন্ধে একটা সহজ সঙ্কোচ, একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল, সুতরাং কোথাও তিনি ইহার সবিস্তার বর্ণনা করেন নাই, আধুনিক বাস্তব লেখকদের ন্যায় প্রতিদিনকার গ্লানি ও কলঙ্কচিত্র পুঞ্জীভূত করিয়া চিত্রকে মসীময় করিয়া তোলেন নাই, সর্ববিধ তথ্যবিস্তার সযত্নে বর্জন করিয়াছেন ।" ১৮

শ্রীকুমারবাবু নীতির মানদণ্ডে রোহিণীর বিচার করেছেন, মানবতার মানদণ্ডে নয় । নীতি পরিবর্তনশীল, মানবতা অনেক বেশি স্থায়ী । জীবনের মতো কোনো স্থায়ী ব্যাপার মাপতে মানবতার মতো স্থায়ী কোনো মানদণ্ডই ব্যবহার করা উচিত । রোহিণীকে ঘর থেকে বের করে এনেছিল গোবিন্দলাল । আমাদের সমাজে পুরুষের একত্রে আবার ঘরে

ফেরার পথ থাকে, নারীর নয়। নারীকে পরিস্থিতির দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয়। প্রসাদপুরের জীবনের মার্কা পাওয়ার পর রোহিণীর নিশাকর সঙ্গ তাই সংগত। তাছাড়া নিশাকরের সঙ্গে রোহিণী যথার্থই প্রেম করতে যায় নি। নিশাকর-প্রসঙ্গ রোহিণীর বৃত্তান্তের দ্রুত অবসানের জন্য বঙ্কিমের ব্যবহৃত নয় কোন শিল্পকৌশল।

নিজেদের সম্পর্ক সম্বন্ধে রোহিণীর কাছে গোবিন্দলাল জানতে চাইলে সে বলেছে (২।১)—"যতদিন পায়ে রাখেন তত দিন দাসী। নহিলে কেহ নই।" রোহিণী নিজেকে বোধহয় সবচেয়ে ভালবাসত। তাই উদ্যত পিস্তলের সামনে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তার কাতর প্রার্থনা — (২।১) —

"চরণে না রাখ বিদায় দাও।

"মারিও না। মারিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। .... আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।"

এই নারী চরিত্রটির প্রতি ঔপন্যাসিকের কোন দুর্বলতাই যেন ছিল না। কিন্তু উপন্যাস-পাঠে পাঠকের মনে সর্বরিক্তা বঞ্চিতা এই নারীটির প্রতি সমবেদনা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। রোহিণীর আকস্মিক মৃত্যু পাঠককে হতচকিত করে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসগুলি নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই জন্য যে, পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাস পূর্বোক্ত সামাজিক-পারিবারিক আখ্যানের উপরেই বেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া বিশ শতকে সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রের গতি প্রকৃতিতেও রয়েছে কম-বেশি বঙ্কিমের অনুসরণ। বঙ্কিম উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়নে, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক শ্রী অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের যে বিশালতার চিত্র রয়েছে তা একদিকে মহাকাব্যের অনুরূপ আবার অপরদিকে নাটকীয় ঘটনাবৈচিত্র্য, উপন্যাসের গ্রন্থননৈপুণ্য এবং চরিত্রচিত্রণ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি করিতে পারে। — উপন্যাসের বিশালতা, গভীরতা, কল্পনার ঐশ্বর্য এবং দৈনন্দিন জীবনের বর্ণাঢ্য চিত্র আর কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যে এতটা প্রবল হতে পারেনি। যে আদর্শ ও চরিত্রনীতি জীবননীতির পরিপন্থী নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। — সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে

বঙ্কিমচন্দ্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে।

বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮ - ১৯০৯) বঙ্কিম-চন্দ্রের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা [১১] ও প্রভাবে, ঐতিহাসিক ও অধিক কল্পনাপ্রধান (বঙ্গ-বিজেতা - ১৮৭৪, মাধবীকঙ্কন - ১৮৭৭) ; ঐতিহাসিক (মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত - ১৮৭৮ ; রাজপুত জীবনসন্ধ্যা - ১৮৭৯) এবং পারিবারিক জীবনধর্মী (সংসার - ১৮৮৬ ; সমাজ - ১৮৯৪) এই ছখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। ঔপন্যাসিককে ভাব-কল্পনাপ্রবণ হতে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কল্পনার সঙ্গে তথাকথিত 'ঐতিহাসিক রস' [১২] মিশিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র ইতিহাসের তথ্যকে কল্পনায় রঞ্জিত ও মানবজীবনের কাহিনীকে রসধারায় সিঞ্চিত করে উপন্যাসের সার্থক শিল্পরসরূপ দিতে পারেন নি। ঐতিহাসিক তথ্যের অতিরেকে তাঁর উপন্যাস 'ইতিহাসের ফাঁসে' 'শ্বাসরুদ্ধ'। ব্যক্তিত্বের অনন্যপরতায় চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়নি। বিবৃতিমূলক কাহিনী বয়নে খুব ব্যস্ত থাকায় চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ দিকটির চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক তেমন নজর দিতে পারেন নি — যা সে যুগের উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য। শিল্প প্রতিভার পার্থক্যের জন্যই উপন্যাসের গঠন কৌশল ও চরিত্র সৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের অনুসরণ সত্ত্বেও ততটা সার্থক নন।

'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাস দুটি যেন কালব্যবধানে একই উপন্যাসের দুটি অংশ। এরা বাঙালির সামাজিক পারিবারিক গ্রামীন সুখ দুঃখময় জীবনের নিখুঁত আলোক-চিত্র। সহজ সরল ভাষায়, সহানুভূতির সঙ্গে অতিরিক্ত খোলাখুলিভাবে প্রকৃত বর্ণনাও বিশ্লেষণে মানবজীবনের গভীর রহস্য তেমন ঘনীভূত হয়ে কাহিনীতে রসরূপ পায়নি। তাছাড়া সমাজে বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনে ঔপন্যাসিকের অতিরিক্ত প্রবণতা থাকায় চরিত্রসৃষ্টিতেও তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। বিশ্লেষণের অভাবে চরিত্রগুলির গভীরতা বা জটিলতা বিশেষ কোন সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে নি। সেই সময়ে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকরা অগ্রণী ছিলেন না। তবু শরৎ-সুধার প্রণয়, পরিণতিতে এগিয়ে যাবার কালে সুধার আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে তার ভাবনা-চিন্তায় আশা-নৈরাশ্যের আলো-আঁধারির ঝিকিমিকি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। (২৩ পরিচ্ছেদ)। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে, কাহিনী বিশ্লেষণে যতটুকু চরিত্রের

বিকাশ দরকার তার বেশি একটুও এগোতে ঔপন্যাসিক রাজি ছিলেন না ।[২১] তাই 'চরিত্রের অন্তর্নিহিত মানসিক ভাব-সংঘাত ও দ্বন্দ্বজটিলতা ঘটনার স্রোতে যেন চাপা পড়ে গেছে ।'

উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধর্মী হলেও 'সংসার' যতটুকু বা ঔপন্যাসীয় সাফল্য অর্জন করেছে 'সমাজ' তাও পারেনি । জমিদার পরিবারের রহস্যাবৃত আখ্যানের উদ্ঘাটনে এবং কাহিনী গ্রন্থণে ঔপন্যাসিক বাস্তববাদী মনের পরিচয় দিয়েছেন । রমাপ্রসাদ চরিত্রটির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় । তবে এই চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন হয়ে পড়েছে । আত্মগ্লানির নরক-অনলে শোধিত হয়ে উমার স্বামী ধনঞ্জয় মনের দিক থেকে পাপমুক্ত হয় । ভেকধারী কামিনীকান্তের চরিত্রটি এক বক্তা । তবে তার অবলা স্ত্রীর নিঃসহায় ব্যথা পাঠক-মনে সমবেদনা জাগাতে সমর্থ হয়েছে । অবশেষে বলা যায়, উদার মুক্ত মন ও প্রগতিবাদী মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে রমেশচন্দ্রের এই ধরণের উপন্যাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রসংশার যোগ্য । শিল্পের সূক্ষ্মতা না থাকলেও কাহিনী চিত্রধর্মী নিখুঁত বাস্তব বর্ণনায় যে শিল্পীমনের পরিচয় ঔপন্যাসিক রেখেছেন — তার প্রকাশ গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সরল বুকের মধ্যে ফুটে উঠেছে । সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস রচনায় পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকগণ যে বিষয়রস গ্রহণ করে চলেছেন তার যথার্থ সূচনা রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসে হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না ।

স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যে বঙ্কিম-বিরোধী[২২] মনোভাব নিয়ে বঙ্কিমযুগে যে ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছিল — সেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১) একজন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন । এই জনপ্রিয়তার মূলে যে এককালের খ্যাত উপন্যাসটি — তার নাম 'স্বর্ণলতা' । একখানা বই লিখে ঊনিশ শতকে তাঁর মত কোন ঔপন্যাসিক রাতারাতি খ্যাতিমান হতে পারেন নি ।[২৩] তবে প্রসঙ্গত বলা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশকে তারকনাথের মতই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাবে যে আরেক জন ঔপন্যাসিক পাঠকমন লুট করে নিতে পেরেছিলেন তিনি হলেন শরৎচন্দ্র । 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের প্রথম তিনটি সংস্করণে যেমন ঔপন্যাসিকের

নাম ছিল না — তেমনি শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' যখন ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখনও লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্রের নাম ছিল না। বলাই বাহুল্য, উপন্যাসের আখ্যানের বিষয়বস্তু নির্বাচনে শরৎচন্দ্র যেন তারকনাথেরই উত্তরসূরী। [১৪]

বিরোধী মনোভাব নিয়ে তারকনাথ লেখনী চালনা করলেও বঙ্কিমীপ্রভাব তাঁর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল — তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর রচিত উপন্যাসে। 'স্বর্ণলতা'র স্বর্ণলতা-গোপাল প্রেম প্রসঙ্গ বঙ্কিমের বিভিন্ন প্রভাবের অন্যতম উদাহরণ। 'অদৃষ্ট' উপন্যাসের আত্মকথনরীতি — বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' উপন্যাসেরই অনুসারী। এছাড়া বিষয়বস্তুতে ইন্দিরার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের দুঃখজনক কাহিনীর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। সবশেষে অবশ্য নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অদৃষ্টের গুণে ইন্দিরা আবার স্বামীর ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল। তাছাড়া জনপ্রিয়তাই সব-সময় সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি নয়। কোন বছরের **Best- Seller** কয়েক বছর পরেই পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, এমন দৃষ্টান্তও সাহিত্যে রয়েছে। তারক-নাথের উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। মৃত্যুর পরেই তাঁর 'স্বর্ণলতা'র খ্যাতি নিষ্প্রভ হতে শুরু করেছিল। তার কারণ সমালোচকের ভাষায় —"অখণ্ড জনপ্রিয়তার জয়মাল্য ধারন করিলেও তারকনাথের উপন্যাস ... সার্থক উপন্যাস হইতে পারে নাই।" [১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী উপন্যাস পাঠে তারকনাথের মন ভরেনি বলে তিনি বাস্তবনির্ভর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস লিখতে কলম ধরেন। তাঁর বাস্তববাদী মন তাঁকে বাঙালির সাধারণ একানুবর্তী গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য আনন্দ-বেদনার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কনে উৎসাহিত করে তোলে। চরিত্র সৃষ্টির পিছনে কাজ করে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ। [১৬] তাঁর উপন্যাসে সাধারণ বাঙালি পাঠক সাময়িক ভাবে পেয়েছিল প্রাণের আরাম মনের শান্তি। তবে জীবন সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার ফলে 'স্বর্ণলতা'য় জীবনদর্শন খুঁজে পাওয়া ভার। বাঙালির গ্রামীণ সাদামাটা জীবনের পাঁচালি এই উপন্যাস। সমাজে ঔপন্যাসিক যা দেখেছেন, শুনেছেন উপন্যাসে তারই রূপায়ণ ঘটেছে নিখুঁত ভাবে। তার ফলে কাহিনী গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে। চরিত্রগুলির স্বার্থপরতা, ক্রুরতা, অন্যদিকে পরার্থপরতা ও আদর্শবাদিতা — বিবর্তনহীন একরতা হয়ে উঠেছে। বাইরের ঘটনার আঘাত-সংঘাতে

বা চরিত্রগুলির অন্তরের কোন যথার্থ দ্বন্দ্ব তেমন ভাবে ফুটে উঠেনি । তাই চরিত্রগুলি হয়ে পড়েছে — হয় ভাল নয় মন্দ । এ ছাড়া উপন্যাসশিল্পে, পাপের ক্ষয়, ধর্মের জয় এই নীতি উপদেশ একেবারে অচল । বাস্তবে এটাই ঘটেছে 'স্বর্ণলতায়' । এর পরেও অতিরিক্ত ঘটনা ও চরিত্র সংযোজনে উপন্যাসের নিবিড়তাকে নষ্ট করেছে ।

তারকনাথ কয়েক খানা উপন্যাস লিখেছেন (স্বর্ণলতা — ১৮৭৪, হরিষে বিষাদ — ১৮৮৫, অদৃষ্ট — ১৮৯২, বিধিলিপি — ১৮৯১) তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'স্বর্ণলতা' । 'বিধিলিপি' অসমাপ্ত এবং 'হরিষে বিষাদ' অকিঞ্চিৎকর । 'স্বর্ণলতা'য় খানিকটা বক্তব্য তারকনাথ প্রকাশ করেছেন — অবশিষ্টাংশ উপস্থিত হয়েছে 'অদৃষ্ট' উপন্যাসে । এই দু'টি উপন্যাস মিলে তারকনাথের ঔপন্যাসিক চিন্তা-ভাবনার পূর্ণাঙ্গরূপ উদ্ঘাটিত ।

গ্রামীন জীবনের পরিবেশে 'স্বর্ণলতা'র কাহিনী গড়ে উঠেছে । যৌথ পরিবারের ভাঙন এবং পারিবারিক অন্যান্য সমস্যাই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় । উপন্যাসের আখ্যানে দু'টি কাহিনী স্পষ্ট সীমারেখায় চিহ্নিত — একটির সঙ্গে অন্যটি (যোগসূত্ররূপে অবশ্য গোপালকে ভেবে নেয়া যায়) সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ নয় । দু'ভাই (শশিভূষণ ও বিধুভূষণ) ও তাদের দুই স্ত্রীকে (প্রমদা ও সরলা) কেন্দ্র করে উপন্যাসের প্রথম কাহিনী জটিলভাবে আবর্তিত হয়ে সরলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে । দ্বিতীয় কাহিনীটি স্বর্ণলতা ও গোপালকেন্দ্রিক, তাদের মন দেয়া-নেয়া, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনী পূর্ণতা পেয়েছে । এই উপন্যাসে স্বর্ণলতা অন্যান্য প্রধান চরিত্রের অন্যতমা । তাই নায়িকা-ভিত্তিক নামকরণ হয়নি বলে, তা ত্রুটিযুক্ত । উপন্যাসের আখ্যান ঘনপিনদ্ধ নয় এবং গঠনকৌশলেও তারকনাথের শিল্পীমনের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না । চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয়বুদ্ধিধারী দুর্বল প্রকৃতির স্ত্রী অন্ত-প্রাণ শশিভূষণ । ব্যক্তিত্বহীন হওয়ায়, স্ত্রীর পরামর্শে ভাইকে পৃথগন্ন করে দেবার পরে মনে তার আক্ষেপ উপস্থিত হয় —' কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম' । পরে তার চেতনা জেগে উঠলে সে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এগিয়ে আসে । প্রমদা জীবন্ত চরিত্র । হিংসা ও স্বার্থপরতায় তার চরিত্র একরঙা, কোন বিবর্তন নেই । সংসারে ভাঙন ধরাতে তারই মুখ্য ভূমিকা । বিধুভূষণ সহজ সরল আলা-ভোলা গোছের মানুষ । তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই তার কৃতকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে । সরলা যথার্থ

বাংলার গৃহবধূ । সহনশীল, স্বামীগত-প্রাণ, মাধুর্যময়ী ও সতীসাধ্বী নারীর মূর্ত প্রতীক সরলা । দায়-দায়িত্ব পালনে সে সতর্ক । একান্নবর্তী পরিবারের যথার্থ ধারক সরলা । সংসারকে জীবনের সারটুকু দান করে বঞ্চনা লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে সে বিদায় নেয় । প্রমদার বিপরীত চরিত্র সরলা । ঝি শ্যামার চরিত্র — বিভূতিভূষণের সৃষ্ট বুধোকাকার চরিত্রের কথা পাঠককে মনে করিয়ে দেয় । সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী এই ধরণের ঝি-চরিত্র এখন সংসারে বিরল হয়ে পড়েছে । গোপালের চরিত্রের বিরাট ভূমিকা উপন্যাসের দু'টি কাহিনীর যোগসূত্র স্থাপনে । চরিত্রটি তেমনভাবে উপন্যাসে প্রস্ফুট নয় । অন্যান্য চরিত্রের গড্ডলিকা প্রবাহে যোগ না দিয়েও টাইপ চরিত্রের নীলকমল, পাঠককে রসরসে ডুবিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে বলে সার্থক । গদাধর গ্রাম্য-স্থূল প্রকৃতির চরিত্র । ন্যায়-নীতির বালাই নেই তার — সব ধরণের অপকর্মের গুরুঠাকুর সে । স্বর্ণলতার ভূমিকা উপন্যাসে স্পষ্ট নয় । অতিরিক্ত আদর্শ বা সেই সমাজে প্রেমিকার ভূমিকায় চরিত্রটি অনুজ্জ্বল হয়ে পড়েছে । সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটি সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করার মতো —

> "আখ্যান-বিবৃতির মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা ও ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । কাহিনীটি সুখপাঠ্য ও নানা কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র ও প্রসঙ্গের সন্নিবেশে উপভোগ্য, কিন্তু কোথাও গভীর মনস্তত্ত্ব জ্ঞান, চরিত্র-বিশ্লেষণ বা দৃশ্য-বর্ণনায় স্মরণীয় কলাকৌশল দেখা যায় না ।" [২৭]

অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের অহংকারে, জ্ঞান-ছুঁয়াচুরী বিদ্যার গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে মানুষ যে কতটা অধঃপাতে গিয়ে অমানুষ হয়ে পড়তে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেবার উদ্দেশ্যেই যেন তারক নাথ 'অদৃষ্ট' উপন্যাসটি রচনা করেছেন । তা ছাড়া, বৃত্তিগত-ভাবে মানুষ যে কর্মই গ্রহণ করুক না কেন তা যেন কখনোই তার মনুষ্যত্ব বিকাশের [illegible]ন্থী হয়ে না দাঁড়ায় । লেখক আরও বলতে চেয়েছেন, মানুষ অদৃষ্টের হাতে অসহায় [illegible]ত্র — অদৃষ্টের অমোঘ বিধান মানুষকে মাথা পেতে অবশেষে গ্রহণ করতেই [illegible]ক তার নিস্তার নেই । এই দিক থেকে বিচারে উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ [illegible] ।

আত্মকথনরীতিতে সাবলীল ভঙ্গীতে লেখা 'অদৃষ্ট' বাস্তব কাহিনী ও চরিত্র-ভিত্তিক পারিবারিক উপন্যাস। ভাগ্যবিড়ম্বিত এনট্রান্স পাশ নায়ক যদু নিজের জীবন-কাহিনী আত্মজীবনী লেখার ঢং-এ এই উপন্যাসে রূপ দিয়েছে। উপন্যাস পাঠে পাঠকের বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র কথা মনে পড়ে যাবে। 'স্বর্ণলতা'র মতো 'অদৃষ্টে'র কাহিনী ততটা অগোছালো নয়। গঠনকৌশলের দিক দিয়ে সরল কাহিনীর ঘটনাবলীর সঙ্গে চরিত্রের যোগাযোগে আখ্যান সুবিন্যস্ত ভাবেই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণে যদুর আশা-নিরাশার দোলায়িত জীবন বিশেষভাবে আঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে পরিণতিতে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলি যদুর জীবনের পরিণতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তবে চরিত্রগুলি 'স্বর্ণলতা'র বিভিন্ন চরিত্র-গুলিকে মনে করিয়ে দেয়। 'স্বর্ণলতা'র চরিত্রগুলিই যেন 'অদৃষ্ট' উপন্যাসে অন্য নামে, ভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে মাত্র। মহামায়া যেন সরলারই ভিন্ন সংস্করণ। জয়দুর্গার মধ্যে প্রমোদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো — বিশেষ করে গয়নার বিষয়ে দু'জনার লোলুপতা প্রায় এক। বিধুভূষণের চরিত্রই কিছু গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে যদু চরিত্র গড়ে উঠেছে। তবে সুলোচনার সঙ্গে যদুর প্রেমের সম্পর্ক 'অদৃষ্ট' উপন্যাসে নতুন। তাদের প্রেম সংযমের দ্বারা শাসিত বলে মধুর ও উজ্জ্বল। শশিভূষণের চরিত্রের নানা দিক, দাদা চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সুলোচনার ডাক্তার পিতা, পঞ্চানন ভট্টাচার্যের অনুরূপ। যদুর প্রতি ডাক্তারের খারাপ ও ভালো ব্যবহার তার স্বার্থবোধের দ্বারা চালিত। অবশেষে বলা যায়, 'অদৃষ্ট' উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ব্রাহ্মমতে সুলোচনা-যদুর বিবাহ সংঘটনের মধ্য দিয়ে তারক-নাথের প্রগতিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, 'অদৃষ্ট' উপন্যাসটি তারকনাথের উজ্জ্বল প্রতিভার নিদর্শন — যদিও তিনি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের জন্যই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উপন্যাস শিল্পে তাঁর বাংলা সাহিত্যে অবদান সম্পর্কেসমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

> "তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসে নিগূঢ় মর্মবাণী ও রোমান্সের বর্ণাঢ্য অনুরঞ্জন তাঁহার পরবর্তীদের নিকট অনধিগম্যই রহিয়া গেল। কিন্তু উহার বাহিরের কাঠামোটিও স্থূল, অতিপ্রত্যক্ষ সত্যটি ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়রূপেই প্রতিভাত হইল। এই জাতীয়

> উপন্যাসে ক্ষেত্র-সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা যেমন হ্রাস পাইল, উহার সমাধানটিও তেমনি সুলভ হইল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই নতুন ধারার পথিকৃৎ। তিনিই বঙ্কিমের প্রতিভার বিমিশ্র জটিলতা, বিচিত্র উপাদান-গঠিত অপূর্ব শিল্পসুষমা হইতে একটিমাত্র উপাদান পৃথক করিয়া উহাকে বাঙালীসুলভ সহজ জীবনপ্রীতি ও কোমল ভাব রমণীয়তায় অতিরিক্ত করিয়া পরবর্তী-যুগের ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করিলেন ও এই ধারা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে উহার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।" [২৮]

উনিশ শতকের লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭ - ১৯৩২) শ্রেষ্ঠ বলা যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি তাঁর প্রতিভার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হলেও রমেশচন্দ্রের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় স্বদেশপ্রেম তাঁর সাহিত্যে বিশেষ আসন লাভ করেছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশের ঐতিহ্য এবং তার গৌরবময় ভূমিকাকে আশ্রয় করে ভারতীয় জীবনকে উপন্যাসে রূপ দিতে। তাই দেখা যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু স্বদেশ-প্রেম। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন চার খানা — (ছিন্নমুকুল - ১৮৭৯ ; মুকুলীর ইমামবাড়ী — ১৮৮৮ ; স্নেহলতা, ১ম ও ২য় খণ্ড — ১২৯১ ও কাহাকে — ১৮৯৮)। এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, তৎকালীন সমাজ-স্বদেশ-ধর্মকেন্দ্রিক তত্ত্বের যুক্তি-তর্কের বাতাবরণে লেখিকার ভাব-আদর্শ উপন্যাসীয় রসশিল্পের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই তাঁর ব্যবহৃত গান বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে তৃতীয় মাত্রা যোগ করেছে। তবে 'কাহাকে' উপন্যাসে একটি গান যেন উপন্যাসটির প্রাণভ্রমরা। ('যায় | মিলন হোলো')। বঙ্কিম-চন্দ্রের পরে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া উপন্যাসে গানের ব্যবহারে এমন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি তাঁর মতো আর কেউ করতে পারেন নি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস 'কাহাকে' তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো তত্ত্বের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। লেখিকার এই উপন্যাসটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হয়েছে।

'কাহাকে' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মত আত্মকথন রীতিতে উত্তম পুরুষে নায়িকার জবানীতে বিবৃত হয়েছে। এই রীতিতে উপন্যাসটি রচিত হওয়াতে লেখিকার মৃত্যু নিরীক্ষণ

স্নয়তায় মহিলা মনোভাবের ছাপ সুস্পষ্ট — উপন্যাসে ঘরোয়া ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠে উপন্যাসের বাস্তবতা (Illusion of reality) পাঠক মনকে বিশেষ তৃপ্তি দিতে সাহায্য করেছে । মাঝে মাঝে বিবৃতির মধ্যে নায়িকার মনের খণ্ড চিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । যেমন, উপন্যাসের প্রারম্ভেই দেখা যায়, নায়িকা খোলা মনে নিজেকে স্মৃতিচারণায় পাঠকের কাছে তুলে ধরছে, তার বিবৃতিতে —

> "যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি, তখন হইতে দেখিতে পাই — কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা ; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে — আমার অস্তিত্বই সমস্যা ।"

উপন্যাসটির বিষয়বস্তু প্রণয়ভিত্তিক । এতে একটি সুশিক্ষিতা 'অস্তিত্ব'ময়ী কুমারী নারীর মানসিক ভাবনা-চিন্তা, আশা-নিরাশা, সংশয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদির বাঙময় রূপায়ণ ঘটেছে — তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখিকার সেই সময়কার সামাজিক মনের প্রতিফলন ।

যুবতী নারী মৃনালিনীর প্রেম-সমস্যা উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় । তার কাছে প্রেম ও জীবন সমার্থক । বাল্যকালে পিতার স্নেহ-বাৎসল্যে নায়িকা মানুষ । পিতার প্রতি মমতা মাখানো ভালবাসা এবং বাল্যসখা ছোটুর প্রতি তার অনুরক্তি আস্তে আস্তে তার মনে ঘনীভূত হয় । ছোটুর কণ্ঠের একটি গান এই বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে । তার জীবন থেকে ছোটু হারিয়ে গেলে অনেক পরে পরিচয় হয় বিলেত-ফেরত মিস্টার রমানাথ ঘোষের সঙ্গে । তার গান শুনে গানের অনুষঙ্গে মনির মনে হারিয়ে যাওয়া সখা ছোটুর স্মৃতি জাগরিত হয়ে নানা সুখ-স্বপ্ন তাকে বিভোর করে তোলে । গানের আকর্ষণেই সে রমানাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাকেই জীবনে বরণ করতে পারবে এই আশায় মন তার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে । পরে রমানাথের বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ (Engaged) হয়ে থাকার খবর জেনে, কুমারী-প্রেম ব্যর্থ হবার আশঙ্কায় সে মর্মাহত হয় । অসুস্থ হয়ে পড়লে মণির ভগ্নীপতির চিকিৎসক-বন্ধু চিকিৎসায় এবং তার উদার সহানুভূতিমূলক মধুর ব্যবহারে মণি তার মধ্যে ছোটুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়ে উঠে । এবার কাকে সে জীবনসঙ্গী করবে এই ভেবে তার দোলাচল মনে দ্বন্দ্ব

উপস্থিত হয়। সে সরাসরি রমানাথের জীবন থেকে নিজের অব্যাহতি চাইল। অন্যদিকে মণির পিতা জোটুর সঙ্গে তার বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করে ফেলে। কিন্তু এদিকে বাল্য-সখা জোটুর কাছ থেকে পরিণত বয়সের যুবতী মণির মন তখন অনেক দূর সরে গিয়ে সংসার জীবনে ডাক্তারকে জীবন-সাথীরূপে গ্রহণ করে সুখনীড় বাঁধবার স্বপ্ন সফল করতে চলেছে। মণির এখন উভয়-সংকট। কাকে ছেড়ে কাকে গ্রহণ করে সে। একদিকে পিতার মনোনীত বাল্য সখা পাত্র জোটু — অন্যদিকে নিজের পছন্দমত নির্বাচিত পাত্র ডাক্তার — যাকে না পেলে মণির জীবন ঊষর-মরুতে পরিণত হবে। জীবন যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল তখনই নাটকীয়ভাবে জানা গেল, যে বাল্যসখা জোটু, সে-ই পরিণত বয়সের যুবা ডাক্তার আর যাকে সে মন-প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে। পরে তাদের ভালবাসা মন দেয়া-নেয়ার সাপেক্ষে বিবাহ বন্ধনে বৃহৎ সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়।

উপন্যাসটির শেষের দিকে ঘটনাগত নাটকীয়তা থাকলেও — ঘটনা কখনোই উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি। নায়িকা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলাই ঔপন্যাসিকের চেষ্টা ছিল। মৃণালিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বহিরাগত ঘটনাজাত নয় — সবই অভ্যন্তরীন। ভালবাসা পাবার আশায় অন্তরের দানপাত্র সব সময়েই সে উন্মুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু যায়। সেই মনের মানুষ কে? কাকে সে বরমাল্য দিয়ে বরণ করে নেবে? তার মনের দ্বন্দ্ব এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে গেছে। সদুত্তর খোঁজার আশায় নিজের মনেই সে বলেছে —

> "পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি। কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালবাসিয়াছি।"

আবার কখনো, সে নিজেই যেন নিজের মনের হদিস খুঁজে পায় নি —

> "নিজের জীবন প্রকাণ্ড একটা প্রহেলিকা।"

রমানাথকে প্রত্যাখ্যানের পরে তার মনের চেতনপ্রবাহের দিকটি তাঁর উক্তিতে প্রস্ফুট —

"মনের মধ্যে একটা কেমন অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতির জন্য আগ্রহ, কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কি, তাহার আকৃতি কিরূপ, স্থিতিই বা কোথায়, তাহা সে ভাবনার মধ্যে নাই।"

উপন্যাসের বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই লেখিকার ভাষা ব্যবহার তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র - রমেশচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও এই উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীর স্বকীয়তার স্বাক্ষর যে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। নারী মনোভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও মানবজীবন ও সমাজসচেতনতা তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে 'কাহাকে' উপন্যাসে নারীর মনোবিকলন ও মনস্তত্ত্বের যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন তা পরবর্তীকালের আধুনিক ঔপন্যাসিকের প্রেরণাস্বরূপ বলা যায়।

উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঊনিশ শতকে তিনখানা উপন্যাস (করুণা – ১৮৭৭-৭৮ ; বউঠাকুরাণীর হাট – ১৮৮৩ ; এবং রাজর্ষি – ১৮৮৭) তিনি লিখেছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে লেখা 'করুণা' তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস। [২৯] অল্প বয়সে রচিত অপরিণত উপন্যাস বলে সংবেদনশীল লেখক পরবর্তীকালে 'করুণা'কে বই হিসেবে প্রকাশ করতে চান নি — বোধ হয় সঙ্কোচই তার কারণ। কিন্তু তাই বলে উপন্যাস হিসেবে 'করুণা' — করুণা করার মত নয়। অবিশ্চিৎকর বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপেক্ষণীয় মনে হলেও এ উপন্যাসে এমন কিছু বক্তব্য নীহারিকার আকারে নিহিত ছিল যা পরবর্তীকালে পরিণত রূপ পেয়ে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালের উপন্যাস 'চোখের বালি' ও 'যোগাযোগ' - এর চরিত্রসৃষ্টি করার সময় রবীন্দ্রনাথের 'করুণা'র কথা স্মরণে ছিল মনে হয়। ঊনিশ শতকের কোন ঔপন্যাসিকেরই বঙ্কিম-প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি উপন্যাসেও বঙ্কিম-প্রভাব রয়েছে। তবে অদ্ভুত প্রতিভাধর যাঁরা, তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র পথের দিশারী হতে বেশি দেরী হয় না — রবীন্দ্রনাথেরও দেরী হয়নি ; 'চোখের বালি' উপন্যাসই তার প্রমাণ।

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের ঘটনার ঘনঘটার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেননি।

মন নিয়ে জীবনের যে অগ্রগমন — আর সেই মনের গহনে যে অচলান্ত জটিল রহস্য, তার উন্মোচনের প্রয়াসী হয়ে তিনি মানব-জীবনকথা উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। আর তাঁর এই মানবজীবন আবার ব্যক্তিসত্তার আলোকে উজ্জ্বল এবং বিশেষ জীবনাদর্শে চালিত। কিন্তু প্রথম দিককার এই তিনখানা উপন্যাস কিন্তু ব্যতিক্রম। নাটকীয়তা, রহস্য ও পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টির প্রয়াস আখ্যানে উপস্থিত। ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের আখ্যানে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে পাঠকের মনে কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় রাখা ঔপন্যাসিকদের প্রধান কাজ। লেখকের প্রচেষ্টা থাকে আখ্যানে রহস্য সৃষ্টি, আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে তোলার। তার ভিতর দিয়েই ত্রিস্তর-আখ্যান উপন্যাসের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। পূর্বেও বলা হয়েছে উপন্যাসের কাহিনীর চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন রেখেছেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর উপন্যাসে নাটকীয়তার অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নাটকীয়তার আশ্রয় গ্রহণ যে বঙ্কিমের অনুসারী — তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম দিককার নাটকের ('বিসর্জন' — ১৮৯০; এবং 'রাজা ও রাণী' — ১৮৮৯) নাটকীয়তা সৃষ্টিতে শেক্সপীয়ারের যেমন অনুসরণ রয়েছে তেমনি উপন্যাসের নাটকীয়তা সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র কাহিনী ও চরিত্রের নাটকীয়তার প্রতি সচেতন থেকে এদের নাট্যরূপ (প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ; এবং বিসর্জন) দিয়েছিলেন, বোধ হয়। তাছাড়া দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক উপন্যাসেই রয়েছে কোন না কোন, আইডিয়া, থীম বা তত্ত্ব। এই তিনটি উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে রয়েছে সহিংস নিষ্ঠুর ভ্রমশক্তির সঙ্গে অহিংস মঙ্গল-কল্যাণধর্মী হৃদয়ধর্মের সংঘর্ষ, যা আইডিয়া রূপে উপন্যাস তিনটিতে ভিতরে ভিতরে কাজ করে চলেছে।

সহানুভূতিশীল, পরদুঃখকাতর, আবেগ-উচ্ছ্বাস-প্রবণ দরদী কিশোর কবিমন অহেতুক এক হৃদয় বেদনাবহ যাতনার শিকার হয়েছিলেন। এই কবিমনের পরিচয় রয়েছে তাঁর সেই সময়কার রচিত আখ্যানকাব্যে ('বনফুল' — ১৮৮০ ও 'কবি-কাহিনী' — ১৮৭৮)। 'করুণা' উপন্যাসও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন এই হৃদয় যাতনা বহন করেই মনে হয়। জটিল প্লটের ত্রিস্তর-আখ্যান সম্বলিত একটি কিশোরী জীবনের করুণ কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক কাহিনীতে চিত্তাকর্ষক এমন কিছু কাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে হয়েছে, যার ফলে আখ্যান-গ্রন্থনে অনভিজ্ঞ

এই ঔপন্যাসিকের অপরিণতির শৈথিল্য রয়ে গেছে। উপন্যাসটিতে তিনটি আখ্যান — নরেন্দ্র — করুণা, মহেন্দ্র — মোহিনী — রজনী এবং পণ্ডিতমশাই — ভাগ্যবতী। নরেন্দ্র - করুণার মূল আখ্যানের সঙ্গে অন্য দুটি আখ্যান উপন্যাসের প্রয়োজনে মিলেমিশে তাকে জোরালো করে তুলতে তো পারেই নি — বরং ভারবাহী হয়ে পড়েছে। কেননা দ্বিতীয় আখ্যানটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উপন্যাসে। তৃতীয় আখ্যানটি বাস্তবসম্মত হয়েও তা প্রধান আখ্যানকে তার অগ্রগতিতে তেমন সাহায্য করে নি। উপন্যাসটিতে নাটকীয়তা সময় সময় অতি নাটকীয়তায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ায় শিল্পসম্মত রূপ ফুটে ওঠেনি। অবশ্য কিশোর কবির কাছ থেকে এর বেশি আশা করা সংগতও নয় — তবু 'করুণার' গঠনকৌশল থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের আঙ্গিক গঠনের শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

আখ্যানের চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াসে লেখক চরিত্রসৃষ্টির দিকে তেমন মনোযোগী হতে পারেননি। বিবৃতিমূলক কাহিনীতে বেশি সংলাপ প্রযুক্ত না হওয়ায় চরিত্র সৃষ্টিতে বাস্তবতার অভাব দেখা যায়, বিশেষ করে উপন্যাসের নায়িকা করুণার চরিত্রে। ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে করুণা চরিত্রটি বিকশিত হয়নি। কবি ঔপন্যাসিকের বিশেষ sentiment - এর পিছনে সক্রিয় ছিল বলা যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলি যেমন, নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, মোহিনী, রজনী ইত্যাদি বাস্তবভিত্তিক এবং সুগঠিত। তবে নরেন্দ্র চরিত্রটি একরঙা। এদের মনোলোকের খবর লেখক কিছু উদ্ঘাটিত করেছেন। 'চোখের বালি'র মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র সৃষ্টির অস্পষ্ট আভাস এদের মধ্যে উঁকি- ঝুঁকি মেরেছে বলে বোধ হয়। [৩০] প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ গদ্য রচনার ভাষা ব্যবহারে আশ্চর্যজনকভাবে সফল।[৩১] 'করুণা' উপন্যাসেও তিনি বক্তব্য - বিষয় অনুসারী ভাষা ব্যবহারে সচেতন ছিলেন। তবে সংলাপে ব্যবহৃত সাধুভাষা তেমন সাবলীল রূপ পায় নি। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। বঙ্কিম-অনুসারী 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস দু'টি ঐতিহাসিক কাহিনী আশ্রিত হওয়ায়, আলোচনায় বিরত থাকা গেল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি তাঁর শক্তির পরিচয় রেখেছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' — এই মানুষের প্রতি প্রেম, ভালবাসা,

দরদ ও সহানুভূতি রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। তাই মানবজীবনের 'সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-মিলন-বিরহপূর্ণ ভালবাসার' প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে তাদেরই জীবনকথার রসরূপ দিয়েছেন। তাতে যত না আছে ঘটনার বিবরণ — তার চেয়ে অনেক বেশি আছে অন্তর উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। আর কবি হচ্ছেন— অন্তরের কারবারী। এই দিক থেকে এটাই প্রমাণ করে, তিনি প্রথমত এবং প্রধানত কবি যা রবীন্দ্রনাথও নানা প্রসঙ্গে বার বার বলেছেন।[৩২] তবু উপন্যাস-সৃষ্টিতেও "যে নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের।"[৩৩]

ঊনিশ শতকে সৃষ্ট উপন্যাসের মোটামুটি একটা আলোচনায় দেখা গেল রোমান্স সমন্বিত ঐতিহাসিক ও সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিকগণ বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। এর পশ্চাতের প্রাণ-পুরুষটি যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, তা বলাই বাহুল্য। বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সব উপন্যাস রচিত হল, তাদের মধ্যে পত্রোপন্যাসও রয়েছে — তাতে ঐতিহাসিক - রোমান্সের বিলুপ্তি ঘটে 'মাটির কাছাকাছি' রয়েছে যারা — সেই সব মানবজীবনের নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাস্তব বিষয় স্থান করে নিল। প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পত্রোপন্যাসের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক (আন্তিক আত্মকথনরীতির সূত্রে) এই সব উপন্যাসের রয়েছে। এই দিক থেকে ঊনিশ শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় বাঙালী ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাস আলোচনার সার্থকতা আছে বলে বর্তমান পরিচ্ছেদটি সংযোজিত হল।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. যোগাযোগ (১ অধ্যায়), র.র., ১।৫৫৩

২. বাংলা চরিত সাহিত্য (১৯৬৪) — দেবীপদ ভট্টাচার্য ; পৃ: ৬১

৩. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৮০) — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ৫৮

৪. সাহিত্যকোষ / কথা সাহিত্য (১৯৬৭) — অলোক রায় সম্পাদিত ; পৃ: ১৪৪ ;
দেবীপদ ভট্টাচার্যের বক্তব্য — ।

৫. ".... বটতলা (অর্থাৎ সস্তা) ছাপাখানা হইতে অজস্র অভব্যধরণের ছোট ছোট পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়া অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত পাঠকের গল্পরসপিপাসা মিটাইত শতাব্দের শেষ পাদে । পরেও এগুলির চাহিদা লোপ পায় নাই, দুই - চারিখানি এখনও ছাপা হয় ।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৯) দ্বিতীয় খন্ড, ঊনবিংশ শতাব্দ — সুকুমার সেন ; পৃ: ১৯০

৬. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ২৭

৭. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৮০) — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ৭০

৮. ভারতকোষ (১ম খন্ড) — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ; পৃ: ৬৩৩ ; শ্রীকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য — ।

৯. বাংলা চরিত সাহিত্য (১৯৬৪) — দেবীপদ ভট্টাচার্য ; পৃ: ৬৯

১০. "পূর্বরাগঘটিত রোমান্স্ — অনূঢ়ার প্রেম — বাঙ্গালীর জীবনে তখনো অসম্ভব ছিল, তাই ইতিহাসের দূরপটভূমিকার আশ্রয় ছাড়া লেখকের উপায়ান্তর ছিল না ।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৯) দ্বিতীয় খন্ড, ঊনবিংশ শতাব্দ — সুকুমার সেন ; পৃ: ১৭৬

১১. ".... গদ্য একই সঙ্গে মানুষের গোচর অগোচর জীবন প্রকাশে সমর্থ হয় অতি সহজে । শুধু সঠিক চিন্তা প্রকাশেরই নয়, যথোপযুক্ত বর্ণনা কেবলমাত্র গদ্যেই সম্ভব । মূর্ত দেশ কালের প্রকৃতি — তার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপ (উপন্যাসে যা অপরিহার্যরূপে আবশ্যিক) পরিস্ফুটনে গদ্যের যোগ্যতা তর্কাতীত । সর্বোপরি জীবনের সন্নিহিত হওয়ার ফলে জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশে গদ্য যেমন সক্ষম, তেমনি সক্ষম জীবনের খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনে । .... অখন্ড জীবনচিত্র যেখানে কাম্য, সেখানে জীবন সংলগ্ন ভাষারই প্রয়োজন, গদ্য সেই

জীবন সংলগ্ন ভাষা । ... সেই জন্য গদ্যই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একমাত্র উপযুক্ত ভাষা।"

বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস (১৯৭৪)—কার্তিক লাহিড়ী ; পৃ: ২৮ - ২৯

১২. "... বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল ...। নায়ক - নায়িকার প্রণয়দুঃখ ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য ।"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৯) ; দ্বিতীয় খণ্ড ;
ঊনবিংশ শতাব্দ — সুকুমার সেন ; পৃ: ২১১

১৩. "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম । ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে ।" 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শেষ দুটি বাক্য ।

১৪. "কোন ঘটনা কোন পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না, সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে এবং সেই অগ্রগতিতে পাঠকের মন ... গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে ।"

আধুনিক সাহিত্য (রাজসিংহ), র.র., ১৩।৯৩৮

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৫২) — সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; পৃ: ১০৯

১৬. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; দ্বিতীয় বক্তৃতা ; — মোহিতলাল মজুমদার ।

১৭. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ১৩১

১৮. তদেব ; পৃ: ১১৮

১৯. বাংলা রচনা পদ্ধতি জানা না থাকায় রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্যসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অনীহা প্রকাশ করলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, "রচনাপদ্ধতি আবার কি — তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে । তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে ।" — নব্যভারত (বৈশাখ - ১৩০১)

উদ্ধৃতিটি আহৃত হয়েছে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' (১৩৭৭) ; ১৭৬ পৃষ্ঠা থেকে ।

২০. "আমাদের অলংকারে ... অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই ।
"সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে । এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ ।"

সাহিত্য (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; র.র., ১৩।৮১৮

২১. "চরিত্র যেন ঘটনার অনুগামী দাস।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ (১৯৭৪) — রামদুলাল বসু ; পৃঃ ১২৩

২২. "কেহ যদি বঙ্কিমের নিন্দা ও 'স্বর্ণলতা'র সুখ্যাতি করিল ত মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পোলাও-কালিয়ার বন্দোবস্ত করিতেন।" 'স্বর্ণলতা'র লেখক সম্পর্কে এই উক্তি। — তদেব ; পৃঃ ৩৩

২৩. লেখকের জীবিতাবস্থায়, সতেরো বছরে উপন্যাসটির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

২৪. "তারকনাথ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের নান্দী গেয়েছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ (১৯৭৪) — রামদুলাল বসু ; পৃঃ ৩৪

২৫. তদেব ; পৃঃ ১৮৩

২৬. মেঘনাদের নিধনের পরে শোকার্ত হৃদয়ে মধুসূদন যেমন তাঁর বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন —"It cost me many a tear to kill him." তেমনি তারকনাথও তাঁর প্রিয় চরিত্র সরলার মৃত্যুর পরে নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন —

" I am very sorry and shed tears for the death of Sarala. Very sorry to part with her. I feel as if I am a murderer. What an awful thing death is.(21st June,1873)

পাদটীকা — তদেব ; পৃঃ ২৫

২৭. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ১৩৫

২৮. তদেব ; পৃঃ ১৩৬

২৯. "'করুণা' উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় নাই — এ কথা ঠিক নয়। কাহিনীটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।" রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক(১৩৭৭), ১ম খণ্ড প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ৫২১

৩০. "একে নিশ্চয় ভাবীদিনের উপন্যাসে প্রযুক্ত চরিত্রের "আঁতের কথা বের করে দেখানো"র কোন পূর্বগামিনী রীতি বলা যাবে না, "চোখের বালি"র সেই তীব্র পর্যবেক্ষণ-শক্তি এখনও এই কিশোরের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত তবু এই গ্রন্থেই চরিত্রের .... বিশ্লেষণ প্রবণতা আছে।"

রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প (১৩৮৪) — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ; পৃঃ ১০২

প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে কবি বা ঔপন্যাসিক তুলনীয়, বলা যায়।[১] বিশ্বচরাচর তাঁর সৃষ্ট; তিনি সব জানেন, সব দেখেন এবং সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারেন।[২] উপন্যাস রচনার সময়, মানবীয় পটভূমির বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষা-পটে বিরাট জীবনের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি সর্বজ্ঞের ভাব ও সর্বদ্রষ্টার রূপ প্রকাশ করতে সক্ষম। এই রূপেই পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি 'সর্বজ্ঞ' (Omniscient) রীতিতে রচিত হয়েছে। প্রথম পুরুষে উপন্যাস রচনা করার সুবিধা যেমন আছে, তেমনি অসুবিধাও কিছু রয়েছে। এই অসুবিধাগুলি (যেমন, উপন্যাসে চরিত্রগুলির কথা ও কাজ — তাদের চিন্তা, উপলব্ধি ও অনুভূতির অন্তরঙ্গতায় অগভীরতা ইত্যাদি) দূর করার জন্য এবং উপন্যাসে বৈচিত্র্যসহ reality-র পরি-প্রেক্ষিতে ঘনত্ব ও নিবিড়তা আনার জন্য আরো অন্তত দু'টি রীতি ঔপন্যাসিক গ্রহণ করে থাকেন — সেগুলি হল আত্মকথনরীতি ও পত্রলিখনরীতি (Epistolary Style).

সাধারণত আত্মকথনরীতিতে আবার দু'ধরণের উপন্যাস রচিত হয়। প্রথমত ঔপন্যাসিক 'আমি' (I as witness) চরিত্রকে উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্রের নীরব সাক্ষী বা পর্যবেক্ষক রূপে দাঁড় করান। নৈর্ব্যক্তিক এই 'আমি' প্রধানত ঘটনাসূত্র ধরে কথকতার মাধ্যমে, প্রায়ই শিথিলধর্মী আখ্যানের সঙ্গে চরিত্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য রেখে, উপন্যাসকে পরিণতির দিকে চালিত করে। এই 'আমি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে — চিঠিপত্র ডায়েরি বা অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্যে (যেমন, 'টেপে' ধরে রাখা স্বগতোক্তি) উপন্যাসের আখ্যান, চরিত্র ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য পাঠকের দরবারে উপস্থাপন করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে রচিত উপন্যাস 'করুণা'র 'আমি' - চরিত্র এই ধরণের উদাহরণ। শরৎ-চন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম দু'পর্বের 'শ্রীকান্তে'র 'আমি'র ভূমিকাও এর সমধর্মী। এই সম্পর্কে সমালোচকের মতামত —

> "এই আত্মচরিত-লেখক নিজেকে একটা চরিত্ররূপে খাড়া করিবার কোন সজ্ঞান চেষ্টা করে নাই, নিজের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র মমতা নাই .... এই কাহিনীও তাহার নিজের কাহিনী ততটা নয়, যতটা অপরাপর কয়েকজন নর-নারীর, অতএব তাহার দৃষ্টি মুখ্যতঃ নিজের দিকে নয়।"[৩]

এই উপন্যাসে 'শ্রীকান্ত'র 'আমি' বিভিন্ন ধরনের আখ্যান ও চরিত্রের মালা গেঁথে যোগসূত্রে উপরিউক্ত 'আমি'র ভূমিকায় নিজেকে উপস্থিত করেছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রথম তিনটি আখ্যান, জ্যাঠামশাই, শচীন ও দামিনী — এই রীতি-তেই রচিত। এই তিনটি অধ্যায়ে শ্রীবিলাসের ভূমিকা দ্রষ্টার। সে উপন্যাসের সূত্রধর হিসেবে কথকের ন্যায় উপযুক্ত তিনটি চরিত্রের বিষয় 'আমি' চরিত্ররূপে বলে গেছে, তাতে প্রয়োজনে সে চিঠিপত্র, ডায়েরি ও বিভিন্ন চরিত্রের কাছ থেকে শোনা স্বগতোক্তিরও ব্যবহার করেছে।

আত্মকথনরীতিতে আরেক রকমের উপন্যাস রচিত হয়; যখন উপন্যাসে 'আমি' (I as protagonist) চরিত্র নায়ক বা নায়িকা হিসেবে নিজের জীবনের ঘটনা-বলী বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যান্য আখ্যান ও চরিত্র বর্ণনা ও বিবৃত করে থাকে। ইংরেজী সাহিত্যে First Person novel - যাকে বলা হয়, প্রথম পুরুষে 'আমি'কে বক্তা করে রচিত উপন্যাস এই ধরনের। এই রকমের বাংলা উপন্যাস — বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এবং শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (৩য় ও ৪র্থ পর্ব) ও 'স্বামী'। এই ধরনের উপন্যাসে নায়ক বা নায়িকাকে 'আমি' চরিত্ররূপে সামনে রেখে তাকে বক্তা করে ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনাপূর্ণ কাহি-নীর চিত্রিত রসরূপ যখন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে পাঠককে উপহার দেন তখন তাকে আত্মজীবনীমূলক বা আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। আত্মজৈবনিক

উপন্যাসের 'আমি' চরিত্রের সঙ্গে পাঠক-মনের সাযুজ্য ঘটে বলে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। আর 'আমি' চরিত্রের ব্যক্তিক আবেগ উচ্ছ্বাসময় বিবৃতিতেও ঘনিষ্ঠতা ফুটে উঠে। যেহেতু উপন্যাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনের অজানিত কথা পাঠক জানতে আগ্রহী — তাই উপন্যাসের নায়ক 'আমি' চরিত্রের বিবৃতিকে ঔপন্যাসিকের বাস্তব জীবনের ঘটনা বলে মনে করে পাঠক সহজেই আকর্ষণ বোধ করে। 'আমি' চরিত্র নিজের জীবনের ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কেই শুধু নয় — উপন্যাসের আখ্যান ও অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধেও পাঠকের মনে বাস্তবের প্রতীতি জন্মাতে সক্ষম। সমালোচকের মতে —

"মোহিতলাল ইহাকে (শ্রীকান্ত) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বা

> Autobiographical Novel বলিয়াছেন । Robinson Crusoe কিংবা David Copperfield যেরকমের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'ও তাহাই । বিশেষভাবে David Copperfield -এর সহিত 'শ্রীকান্তে'র সাদৃশ্য খুব বেশি । ... David Copperfield - শুধু ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নহে, ইহার মধ্যে ডিকেন্সের সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ হইয়াছে । 'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে ।"[8]

প্রসঙ্গত বলা যায়, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস সব সময় যে উত্তমপুরুষেই রচিত হয় তা নয় ; প্রথম পুরুষেও রচিত হতে পারে — তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের* 'পথের পাঁচালী' (১৩৩৬) । লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার দুর্লভ ফসল বাস্তবতার নির্মোকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসকে ভরিয়ে তোলে । তাই এত লেখকের নিজস্বটুকু উজাড় করে দেবার প্রয়াস । এতে উপন্যাসের লেখক এবং নায়ক একাত্ম হয়ে পড়ে। এই ধরনের বাস্তব উপন্যাসে যুক্ত হয় লেখকের আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনুভূতির তন্তুশর্মের সঙ্গে Sentiment- এবং নানা রঙ রস-সমন্বিত আনন্দ-বিষাদ-ঘেরা এক অভিনব মায়ার জগৎ — যা বিশেষভাবে রূপ পায় ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট এক ধরনের আন্তরিক ভাষা ব্যবহারে । ঔপন্যাসিক সব সময় এই মায়ার জগৎটিকে বজায় রাখতে চান বলে নায়ক চরিত্রের তেমন কোন পরিবর্তন উপন্যাসে সূচিত হয় না — তাই প্রায়শই চরিত্রটি Dynamic - চরিত্রের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় । তার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী-গ্রন্থনের দিকটিও ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে ওঠে না । শিথিল কাহিনীই যেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য (ভাল অর্থে) । তবে বাস্তবতার এমন একটি ভান (Pretention) এই জাতীয় উপন্যাসে থাকে যাতে এই সব ঘাটতি পূরণ হয়ে পাঠকের কাছে তা আদরণীয় হয়ে ওঠে ।

দ্বিতীয়ত, আত্মকথনরীতির আরেক শ্রেণীর উপন্যাস রচিত হয়ে থাকে যেখানে উপর্যুক্ত শ্রেণীর উপন্যাসের কথক একজন নয়, একাধিক । উপন্যাসের বক্তা হিসেবে এই সব প্রধান চরিত্র দরদের সঙ্গে উত্তমপুরুষে আত্মকথা বিবৃত করার মধ্য দিয়ে নিজেদের পাঠকের সামনে উজাড় করে তুলে ধরবার চেষ্টা করে । বিভিন্ন বক্তাদের বর্ণনা ও বিবৃতির মধ্য দিয়েই আখ্যান ও চরিত্রগুলি রূপ পেয়ে উপন্যাসের পরিণতির দিকে এগিয়ে

---

*(১৩০০ - ১৩৫৭)

যায় । নিজের বিষয় যথাযথভাবে আত্মকথনে ব্যক্ত করতে পারে বলে নায়ক-চরিত্রের ধারণা থাকলেও সব সময় সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে না । তখন, উপন্যাসের অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলি পরস্পরের আত্মকথনে নিজেদের যেমন পরিস্ফুট করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নায়ক চরিত্রের স্বরূপ ভাঁজে ভাঁজে খুলে পুরোপুরি তুলে ধরতে সক্ষম হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' ও রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' এই প্রকারের আত্মকথনরীতির উপন্যাস । প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি যেহেতু নিজেদের আত্মকথা প্রকাশ করে — তাই এই রীতিকে চরিত্রকথনরীতিও বলা যেতে পারে । কথকের একান্তই নিজের রহস্যপূর্ণ ও গোপনীয় 'না-বলা' কথায় পূর্ণ এই ধরনের উপন্যাস । পত্রোপন্যাসেও দেখা যায় উপন্যাসের বক্তা এক বা একাধিক । নায়ক-নায়িকা বা প্রধান চরিত্রগুলি পত্রাকারে উত্তর-প্রত্যুত্তরে উপন্যাসের আখ্যান ও অন্যান্য চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলে। উদাহরণ — বনফুলের 'কষ্টিপাথর', । অনেক উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা প্রত্যুত্তর না পেয়েও একভাবে বিভিন্ন চরিত্রের পাত্র-পাত্রীর কাছে পত্র লিখে যায় একের পর এক, যার ভিতর দিয়েই আখ্যান ও বিভিন্ন চরিত্র রূপ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উপন্যাসের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে । উদাহরণ — কেতকী কুশারীর, 'নোটন নোটন পায়রাগুলি' । কখনো নায়ক বা নায়িকা একটি চিঠিতেই উপন্যাস শেষ করে ফেলে, উদাহরণ — তরুণকুমার ভাদুড়ীর, 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' । এছাড়া আরো অনেক ধরনের বৈচিত্র্যই পত্রোপন্যাসের রচনাশৈলীতে দেখা যায় । আত্মকথনরীতির মতো পত্রোপন্যাসেও আখ্যান ও নানা ধরনের চরিত্রগুলির পরিণতিতে এগিয়ে দিতে চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, স্মৃতিচারণা, অতীত উদ্ভাস, স্বগতোক্তি, বিবৃতি, ডায়েরি বা 'টেপে' ধরে রাখা জবানবন্দী কাজে লাগান ঔপন্যাসিক । উদাহরণ — কেতকীকুশারীর, 'নোটন নোটন পায়রাগুলি' । অন্তরঙ্গ, সজীব, সাবলীল, সহজ, সরল, মাধুর্যময় ও রসাল ভাষা ব্যবহারেও উভয়রীতির উপন্যাসে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । তাছাড়া চিঠিপত্রে দেখা যায় বিশেষ ধরনের এক ভাষা-ব্যবহার — যা উপন্যাসের তৃতীয় মাত্রা যোগ করে । আমরা আগেও বলেছি, মানুষের যথার্থ স্বরূপ-উদ্ঘাটনে চিঠির বিরাট ভূমিকা । যেহেতু উপন্যাস, মানবহৃদয়ের চলমান ছবি — তাই চিঠিপত্রে বা ডায়েরিতে আন্তরিকতার সঙ্গে ঔপন্যাসিক চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উন্মোচনে যেভাবে প্রয়াসী হন, তাতে অবশ্যই পাঠকের কাছে তা আকর্ষণযোগ্য হয়ে ওঠে । তাছাড়া সত্যাশ্রয়ী তথ্যসম্বলিত পত্র বা ডায়েরি যথার্থভাবে উপন্যাসের action - বা গতিকে

জিইয়ে রাখতে সাহায্য করে । এই কারণে এই রীতির উপন্যাস পাঠকদের কাছে আকর্ষণের । আত্মকথনরীতির উপন্যাসে অতীতের কাহিনী বা ঘটনা বিবৃত হয় । স্মৃতিচরণায় তা উপন্যাসে রূপ পায় বলে বর্ণনার সহজ সাবলীল ভাব-সৌন্দর্য, অনুভূতির তীব্রতা, বেশ খানিকটা নষ্ট হয়ে যায় । অন্যদিকে পত্রোপন্যাসে এমনটি বড় একটা হয় না । কেননা পত্রাকারে ঘটমান বর্তমানে আখ্যান বর্ণিত হয় এবং চরিত্রগুলির ভাবনা-চিন্তার তাৎক্ষণিক রূপ তাদের লেখা চিঠিতে ধরা পড়ে বলে তা উপন্যাসের বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠকদের বিশ্বাস উৎপাদনে সাহায্য করে ।

দেখা যাচ্ছে, পাঠকের কাছে উপন্যাস সবচেয়ে আকর্ষণযোগ্য করে তোলার সাধেতে ঔপন্যাসিকের মনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন এসে গেছে । 'সর্বজ্ঞ' তার দৃষ্টি - কোণ নিয়ে উপন্যাস রচনায় যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় — তাকে দূর করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক আত্মকথনরীতির আশ্রয় নেন । আবার এই রীতির সীমাবদ্ধতার জন্য এর উত্তরণ ঘটে, পত্রলেখনরীতিতে । নিখুঁত রীতি-পদ্ধতি বলে কোন কথা সাহিত্যে নেই । যে কোন রীতিতেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থেকেই যায় । এর থেকে উত্তরণের চাবিকাঠি ঔপন্যাসিকদের হাতে এখনো এসে পৌঁছায়নি — যদিও বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াসে মিশ্ররীতি গ্রহণ করেও উপন্যাস রচনায় তাঁদের বিরাম নেই ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, এঁরা প্রত্যেকেই দু'টি করে উপন্যাসে 'সর্বজ্ঞে'র দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে আত্মকথনরীতি গ্রহণ করেছিলেন । নিছক নতুন ভঙ্গীমায় পাঠকদের চোখ ধাঁধানোর জন্য — না সত্যিকারের উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু ও চরিত্রের যথার্থ রসরূপ প্রকাশ করার জন্য তা দেখা যেতে পারে ; সেই সঙ্গে এই উপন্যাসগুলির আঙ্গিকগত দিক থেকে পত্রোপন্যাসের সাদৃশ্যই বা কতটা ।

'উপকথা' এই অভিধায় 'ইন্দিরা'কে চিহ্নিত করে ছোট্ট অবয়বে বিভিন্ন চরিত্রসহ আখ্যানের পুরুত্বের কথা ঔপন্যাসিক পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন । উপকথায় অসম্ভবতার বীজ লুকিয়ে থাকে । কৌতূহল অবদমিত করে পাঠককে খানিকটা কল্পনায় তা পুষিয়ে নিতে হয় ; যেমন এই উপন্যাসে, স্বামী উপেন্দ্রর কাছে ইন্দিরার বিদ্যাধরী-রূপ গৃহিনীর রূপে পরিবর্তিত হয়ে পড়লে সম্ভাবিত প্রশ্নে, পাঠকের চেতনাকেও নাড়া দিয়ে যায় । এই সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য —

> "তবে 'ইন্দিরা'র স্বামীকে কুসংস্কারপ্রবণ ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাসবান বলিয়া বর্ণনা করিয়া বঙ্কিম ব্যাপারটিকে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।"[৫]

বোধ হয় উপন্যাসের লঘু-চপল হাল্কা কৌতুকের মূল সুরটি বোঝাবার জন্যই ঔপন্যাসিক ইংরেজ কবি শেলীর কবিতাংশটি গ্রন্থারম্ভে উদ্ধৃত করেছেন —

"Rarely, rarely comest thou
Spirit of Delight,
Where for has thou left me now
Many a day and night ? "...[৬]

এছাড়াও পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'বাজিয়ে যাব মল' এই নামকরণে এবং কমলা ও নির্মলার 'খুলব হাসির কল' গানের পংক্তির ভিতর দিয়ে উপন্যাসটির কৌতুক প্রবণতার দিক উচ্চকিত । সুভাষিণীর শিশু পুত্র-কন্যার ভূমিকাও সেই দিকেরই ইঙ্গিতবাহী । পুত্রটির আধো আধো অপরিস্ফুট কথা ও আচরণ এবং কন্যা হেমার ছড়া কাটার ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিকের হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টাই দেখা যায় । 'কালির বোতলের' কথা এবং আচরণেও তা প্রকাশিত । শুধু তাই নয়, serious চরিত্র-বিহীন এই উপন্যাসের Type - চরিত্রের কথা-বার্তা বা আচার-আচরণের মধ্যেই হাসি-তামাশার ভাব ফুটে উঠেছে — আর এর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মিলনান্তক ভাবটা চমৎকারভাবে পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে । নানা প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন হওয়ায় রোমান্টিক কৌতুকরসের উপন্যাসটি মিলনান্তক রচনায় পরিণত হতে পেরেছে । ইতিপূর্বে serious - ধরনের চারখানি রোমান্সধর্মী ও রোমান্টিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেছেন । 'রজনী' রচনার পরেও এই রীতিতেই তিনি পরবর্তী অন্যান্য উপন্যাসগুলিও রচনা করেছেন । মাঝখানের 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'র ক্ষেত্রেই রচনা শৈলীর বৈচিত্র্য এবং বিশেষ ধরনের বিষয়বস্তু ও চরিত্র-সৃষ্টির অন্তরপ্রেরণার প্রয়োজনেই তিনি আত্মকথনরীতি গ্রহণ করেছেন । এখানে স্মরণীয় যে, বঙ্কিম-উপন্যাসের অধিকাংশের ঘটনাস্থল মফঃস্বল বাংলার পটভূমি । 'আভারেজ কাহিনী' এবং 'নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিত্রকে' বঙ্কিমচন্দ্র এড়িয়ে গেছেন । ব্যতিক্রম

'ইন্দিরা' ও 'রজনী' উপন্যাসের কাহিনী। সমালোচকের মতে, — "লক্ষণীয় যে, এই কারণেই রজনী এবং ইন্দিরার ঘটনা ছাড়া প্রায় কোন কাহিনীর ঘটনাস্থল কলকাতায় কল্পিত হয় নি।"[৭] মনে হয় নাগরিক জীবনের এই 'আভ্যন্তরীণ কাহিনী' ও 'মধ্যবিত্ত চরিত্র'-এর জীবন-ঘূর্ণিপাক ও যন্ত্রণা রূপায়ণ যথার্থভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আত্মকথনরীতির ব্যবহার এই দু'টি উপন্যাসে হয় তো করে থাকবেন।

নায়িকা ইন্দিরা উত্তম পুরুষে 'আমি' 'আমি' করে স্মৃতিচারণা করেছে, আত্মকথা প্রকাশ করেছে। একান্ত নিজের জগতের ভাললাগা-মন্দলাগা কথা ও কাহিনী ইন্দিরা নিজের বিশ্বাস ও বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত করে নিবিড় দরদ দিয়ে লিখেছে। এইজন্য যা অপরের কাছে অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত তাও সে তার লেখার সরলতা ও আন্তরিকতার গুণে সঙ্গতিপূর্ণ বলে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছে।

ইন্দিরার হাস্য-পরিহাসপূর্ণ কৌতুকপ্রবণ মন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার জীবনের চরমতম দুঃখ ও বিশৃঙ্খলার দিনেও শুধু প্রাণ-প্রাচুর্যের জন্যই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে দেয়নি। সুভাষিণী ও ইন্দিরার বন্ধুত্বের চিত্রও ইন্দিরা হালকাচালে কৌতুকরসে ভরিয়ে তুলেছে। ইন্দিরার আত্মকথার সাবলীল বর্ণনায় দু'জনের মধ্যে অবস্থার (একজন গৃহকর্ত্রীর পুত্রবধূ, অন্যজন পাচিকা মাত্র) ব্যবধান সত্ত্বেও তা স্বাভাবিক রূপ নিয়েই পাঠকের কাছে উপস্থিত। চতুরতা ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে ইন্দিরার এমনভাবে আত্মকথায় স্মৃতিচারণা, যাতে পাঠকের মনে হবে যখন যা ঘটেছে — তারই হুবহু বর্ণনা সে যেন দিয়ে যাচ্ছে। বলা প্রয়োজন এটি পত্রোপন্যাসেরই বৈশিষ্ট্য। ইন্দিরার বিবৃতি ও বাচনভঙ্গী এমন সহজ নারীসুলভ ঘরোয়া যে, পাঠককে বুঝতেই দেয়নি ভবিষ্যতের সব ঘটনা তার জানা থাকা সত্ত্বেও সে নির্মোহ ও অনাসক্তভাবে তা লিখে যাচ্ছে। আখ্যানে ঘটে যাওয়া তাৎক্ষণিক ঘটনার যে টাটকা সজীব ভাব পত্রোপন্যাসে পাওয়া যায়, তাও আত্মকথনরীতিতে ইন্দিরা সপ্রতিভভাবে তার বিদ্যাবুদ্ধির অনুসারে ভাবে-ভাষায় নারীর মন নিয়ে চাপল্যের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করেছে। বাহুল্যবোধে উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়কার সাধারণ প্রচলিত সাধু-ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। তবে সেই সাধুভাষার চাল কিন্তু চলিতেরই নামান্তর বলা যায়। চলিতের ব্যবহার সাহিত্যে সেই সময় বড় একটা ছিল না। তবে বঙ্কিমীভাষা বলতে

যে সাধু রীতিটি আমরা বুঝি সেই তৎসম শব্দ-বহুল ভাষার ব্যবহার তিনি 'ইন্দিরা'য় করেন নি — আত্মকথনরীতির হালকাচালের উপন্যাস বলেই বোধ হয়। প্রাণবন্ত সাবলীল ঘরোয়া ভাষা, যা পত্রোপন্যাসে ব্যবহৃত হয় — তা-ই বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা'য় প্রয়োগ করেছেন।

'চতুরঙ্গ' আত্মকথনরীতির উত্তম পুরুষে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। নায়ক শচীশের জীবন-জিজ্ঞাসা তৎসহ নায়িকা দামিনীর সঙ্গে তার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে তার পরিবর্তনের আখ্যানই এই উপখ্যানের প্রধান বিষয়। সমালোচকের মতে—

> "চতুরঙ্গে' উনিশ শতকী প্লটের মোহ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস হয়ে উঠল বক্তব্যপ্রধান, ভাবনির্ভর।"[৮]

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্ররূপে শ্রীবিলাসই কথক। অন্তরঙ্গ ও সহানুভূতিশীল বন্ধু শচীশ, শচীশের প্রতিপালক ও পিতৃব্য জ্যাঠামশাই, এবং দামিনীর (শ্রীবিলাসের স্ত্রীও বটে) আখ্যান বিবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত এই সব আখ্যানকে যুক্ত করার প্রয়াসে সে নিজের জীবনের অপ্রধান কাহিনী ও কথা বলে গেছে। উপন্যাসের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে (জ্যাঠামশাই, শচীশ ও দামিনী) শ্রীবিলাসের 'আমি'র (I as witness) ভূমিকা বেশ খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের শ্রীবিলাস-অংশে প্রধান চরিত্র হিসেবে শ্রীবিলাসের 'আমি'র (I as protagonist) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মাঝখানের 'শচীশ' ও 'দামিনী' অংশে শ্রীবিলাস, প্রথম অংশ 'জ্যাঠামশাই' আখ্যানের মতো শুধুই নিষ্ক্রিয় দর্শক নয়। শ্রীবিলাসের স্বগতোক্তি —

> "তিন জনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাটের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত — আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপর রাগও হয়, অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি।"[৯]

'শচীশ' ও 'দামিনী' — এই দুটি আখ্যানের পরিচিতি দানে এবং তাদের জীবনের জটিলতা ও সরলতা প্রাপ্তিতে শ্রীবিলাস যুক্ত হয়ে গিয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। 'শচীশ'

ও 'দামিনী' অংশে শ্রীবিলাসের 'আমি'র ভূমিকা প্রায়শুক্ত দুই 'আমি'র ভূমিকার মাঝামাঝি অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে I as witness বা I as protagonist - কোনটাই পুরোপুরি নয়।

উপন্যাসে নিবিড়তা, দৃঢ়তা, একাত্মতা এবং আখ্যানের সত্যতার (reality) প্রশ্নে, শ্রীবিলাস তার কথকতার মাঝে কয়েক জায়গায় জ্যাঠামশাই ও শচীশ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছে। 'জ্যাঠামশাই' অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে — " মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া লিখিলাম।" উপন্যাসে শচীশের ডায়েরি এবং কয়েকখানা পত্রের ব্যবহারও রয়েছে — যা পত্রোপন্যাসেও দেখা যায়। চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে আত্মকথন-রীতিতে লেখা উপন্যাসে ডায়েরি বা পত্রের ভূমিকা খুবই বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হাতিয়ার বলা যায়। শ্রীবিলাসের জবানী থেকে জানা যায় সে ডায়েরি লেখে "আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না — লেখাও কঠিন" — তার এই আত্মকথন, ডায়েরি জাতীয় ছোট ছোট পৃথক পৃথক অংশে লেখা নয়, তা আংশিক ভাবে ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত হলেও পুরোপুরি স্মৃতি-কথা বলা যায়। যদিও বিদগ্ধ সমালোচক এই বিষয়ে বলেছেন, —" শ্রীবিলাস, আপনার ডায়েরিতে সব কথা লিখিয়া রাখিতেছে' —. ।[১০] এই উপন্যাসে শচীশ অংশের ষষ্ঠ ও দশম পরিচ্ছেদে শচীশের ডায়েরির কিছু অংশের উদ্ধৃতি —

> "নলিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি — দেবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের মুখপাত পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন-রসের রসিক।"

আবার শচীশের ডায়েরির আরেক অংশ —

> "... মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোন দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। একেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া

ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।"

'জীবনের গভীরতলের সূক্ষ্ম রহস্য-ব্যঞ্জনা' ও বাস্তবতার প্রতীতি জাগানোতে ডায়েরির এই উদ্ধৃতিগুলি অপরিহার্য। শচীশের গোপন মনে এবং গহন-হৃদয়ের এই সমস্যার কথা শ্রীবিলাসের জানার কথা নয় — শচীশের ডায়েরির উদ্ধৃতি থেকে সে তার কথকতায় তা ব্যবহার করেছে। দামিনী ও ননিবালা এই দুই নারীর তুলনামূলক আলোচনায়, শচীশের মনোভাব ডায়েরির উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্ট। গুহাদৃশ্যের নায়ক শচীশ-মনের গুহাশ্রিত তার অভিজ্ঞতার বর্ণনাও নিখুঁত। সমালোচকের ভাষায় —

> " একদিকে তীব্র ক্ষুধায় অধীর দামিনীর প্রচণ্ড কামনা, অন্যদিকে শচীশের অবচেতনায় নিগূঢ় দেহতৃষ্ণা — এই দুয়ের অর্থবহ প্রতীকী চিত্র হিসেবে এই ডায়েরির ভূমিকা আলোচ্য উপন্যাসে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। ওই অংশে এই বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত শিল্পদৃষ্টির নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে।"[১১]

আবার শচীশ-দামিনীর জীবনে ঘটে যাওয়া যে ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক শ্রীবিলাস নয়, অথচ সেই ঘটনার বাস্তব বর্ণনা উপন্যাসে (শ্রীবিলাস — চতুর্থ অধ্যায়) ব্যবহৃত। এই বর্ণিত বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে শ্রীবিলাসের স্বীকারোক্তি —" পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি ..." (শ্রীবিলাস — পঞ্চম অধ্যায়)। ঔপন্যাসিকের এই রকম স্বীকারোক্তি-ব্যবহার পাঠক মনে আখ্যানের সত্যতার উপলব্ধি জন্মাতে সাহায্য করে।

মোটামুটি ধারাবাহিক একটা কাহিনী থাকলেও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে চরিত্রেরই প্রাধান্য দেখা যায়। নায়ক শচীশের অন্তর-জীবন সাধনার কাহিনীই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। ভাবপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শচীশের সর্বাঙ্গীন চারিত্রিক দিক ফুটিয়ে তোলার জন্য ঔপন্যাসিকের প্রয়োজন হয়েছে, জ্যাঠামশাই, দামিনী ও শ্রীবিলাসের মতো প্রধান এবং আরো কিছু অপ্রধান চরিত্রের। শচীশের অন্তর-জীবনের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা — সংবেদনশীল, আন্তরিক, জীবনবোধসম্পন্ন শ্রীবিলাস। জ্যাঠামশাই বা দামিনী, শচীশের জীবন-সাধনার বিশেষ বিশেষ খণ্ডিত অংশের সঙ্গে যুক্ত — শ্রীবিলাসের মতো সম্পূর্ণ

ওয়াকিবহাল এরা কেউ নয়। শচীশের ডায়েরি লেখার প্রবণতা থাকলেও, জীবন-সাধনার কাহিনী লেখার মতো মানসিকতা তার ছিল না। উপরন্তু সে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় দামিনী-শ্রীবিলাসের পরবর্তীকালের দাম্পত্য-জীবন-কাহিনীও তার অজ্ঞাত থেকে যায়। শ্রীবিলাসই একমাত্র ধীর-স্থির সাংসারিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠিক মানুষ — যে রয়ে-সয়ে নিজের ভাব-ভাবনা পুঁজিয়ে জীবনের কাহিনীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম। আর এই কাজ বিশেষ ভাষারীতির ব্যবহারে, সাংকেতিকতার প্রয়োগে ঔপন্যাসিক শ্রীবিলাসকে দিয়ে বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন করিয়েছেন বলা যায়। 'চতুরঙ্গে'র ভাষা-প্রয়োগে পুরাণো সাধুভাষা রীতিই ঔপন্যাসিক বজায় রেখেছেন।[১২] অনেকের মনে হতে পারে, যেখানে উপন্যাসের চরিত্রগুলির গহন মনের গোপন কথা ঔপন্যাসিক উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী, সেখানে চলিতভাষাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহন হওয়া উচিত। কিন্তু চতুরঙ্গের মতো বিশেষ আঙ্গিকের উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা বলা বোধ হয় যায় না। এ সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —

> "বস্তুত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নিজস্ব আন্তর প্রয়োজনের টানেই এর আখ্যান বিন্যাসে বিবৃতি ও সংলাপ উভয় অংশেই এই 'আপাত' সাধুভাষাকে গ্রহণ করেছেন লেখক। ....
>
> "... ভাষাকে সংশ্লিষ্ট-সংহতরূপে প্রকাশ-প্রবণতার পিছনে থাকে এক দৃঢ় মনন-চেতনা, বুদ্ধি-উজ্জ্বল মানসিকতা। 'চতুরঙ্গ' — এর ভাষায় এই সংহত বুদ্ধি-দীপ্তির প্রকাশ সুস্পষ্ট। প্যারাডক্স — এপিগ্রাম বা উইট -এ উজ্জ্বল ভাষারীতি লেখক শ্রীবিলাসের বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্য ও নায়ক শচীশের মনন-নির্ভর ব্যক্তিত্ব-প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই।
>
> "..... উপমা-উৎপ্রেক্ষা-যুক্ত চিত্রকল্পধর্মী ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে লেখক পাত্রপাত্রীর মনের যে রুদ্ধ কামনা, অস্থির চিত্তবিক্ষেপ কিংবা হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা— আভাস ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হয়েছেন, তা থেকেই এই বিশেষ ভাষা-রীতির সার্থকতার নিশ্চিত সাক্ষ্য মেলে।"[১৩]

'মানুষের ব্যক্তিত্বের' উন্মোচনে আত্মকথনরীতি যে বিশেষভাবে অপরিহার্য —'চতুরঙ্গ'

উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দিক থেকে পত্রোপন্যাসের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে 'শ্রীকান্ত' রচনা করেননি। তার ফলে এই উপন্যাসে দৃষ্টিকোণের দিক থেকে শরৎচন্দ্রের দোলাচল মনের পরিচয় লক্ষ করা যায়। চার পর্বে শেষ হলেও মৃত্যুর আগে তিনি পঞ্চম পর্বেরও সূচনা করেছিলেন। ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ করে দেব। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বল ৪র্থ পর্ব ভালো হয়নি তবে থাকলো এই খানেই রথ।" এই উপন্যাস রচনায় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব সুস্পষ্ট। শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা এই ছদ্ম নামে শরৎচন্দ্র প্রথমে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' দু'পর্বে প্রকাশ করেন। তৃতীয় পর্ব লিখে নিয়ে তিনি বুঝলেন তাঁর রচনার শীর্ষনাম ভ্রমণকাহিনী দিলেও তা হয়ে উঠেছে খাঁটি উপন্যাস। তখন তিনি ভ্রমণকাহিনীর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন 'শ্রীকান্ত'। ফলে চার পর্বের এই উপন্যাসের স্পষ্ট দু'টো ভাগ। ভ্রমণ কাহিনীর নায়ক হিসেবে শ্রীকান্ত উত্তম পুরুষে 'আমি'র আড়ালে থেকে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র কথকতা শুরু করেছিল, পরবর্তী দু'টো পর্বেও এই 'আমি'কে বজায় রাখল বটে তবে এই 'আমি'র ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো উপন্যাসের কথক 'আমি'তে। প্রথম দু'পর্বের 'আমি' কৌতূহলী ভ্রমণকারীর দৃষ্টি ও মন নিয়ে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ঘটনাকে দেখেছে এবং উপলব্ধি করেছে কিন্তু নিজে এ সবের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়নি। তাছাড়া এই দু' পর্বের 'আমি' কিন্তু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি — যদিও ভ্রমণ-আখ্যানের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ দর্শক শ্রীকান্ত নিজেই। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের 'আমি', রাজলক্ষ্মীর মতো নায়িকার বিচিত্র জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার ফলে এই 'আমি'র ভূমিকা যথার্থ নায়কের ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

'শ্রীকান্ত' আত্মজৈবনিক উপন্যাস। নায়ক শ্রীকান্ত আত্মকথনরীতিতে উত্তম পুরুষে 'আমি' 'আমি' করে তার আখ্যান লিখে গেছে। 'শ্রীকান্ত' আত্মজৈবনিক উপন্যাস হওয়ায়, ঔপন্যাসিকের আত্মকথার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত কাহিনী-চরিত্র-পরিবেশ এতে স্থান

করে নিয়েছে ; এবং এর সঙ্গে জড়ানো-মেশানো রয়েছে সত্য-মিথ্যা, বাস্তব ও কল্পনা । এই সম্পর্কে সমালোচকের মত —

> "বাস্তব শরৎচন্দ্র খন্ড, অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস কিন্তু উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত অখন্ড, পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস । শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রকে ব্যক্ত করিয়াছে যেমন, প্রচ্ছন্নও রাখিয়াছে তেমনি ।" [১৪]

উপন্যাসে যে জীবনাদর্শ ব্যক্ত হয়েছে তা শুধু শ্রীকান্তেরই নয় — ঔপন্যাসিকেরও । উপন্যাস পাঠে, নায়কের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই পাঠক তাই একাত্ম হয়ে পড়ার সুযোগ পায় । সমালোচকের মতে —

> "শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনী — উহা কেবল উপন্যাসই নহে । এইরূপ আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, ইহার নায়ক একাধারে আত্মও বটে, পরও বটে । লেখক যেন আপনাকেই, বাহিরে একটু তফাতে ধরিয়া দেখিতেছেন, ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপ সংস্থান ও পশ্চাৎপট আবশ্যক তাহা উত্তমরূপে সংযোজন করিয়া লইয়াছেন ।" [১৫]

আত্মকথনরীতিতে উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিক ইচ্ছে মতো সহজ-সরল স্বাভাবিক হয়ে সবচেয়ে বেশি পাঠকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান । এটা শরৎচন্দ্রের জানা ছিল মনে হয় । তাই তিনি তাঁর বহুল-ব্যবহৃত পাঠক-মনোরঞ্জনকারী বিশেষ প্রিয় 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে আত্মকথনরীতিতে 'শ্রীকান্ত' রচনায় প্রয়াসী হন । অবশ্য এই রীতি গ্রহণের পিছনে থাকে কাহিনী ও চরিত্রের সার্থক রূপায়ণে উপন্যাসেরই আত্মপ্রেরণা । সমালোচকের মতে —

> "'শ্রীকান্ত' চরিত্র-প্রধান মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস সত্য, কিন্তু ইহার কাহিনী ঘনসংবেদ্ধ নয় । নায়িকা রাজলক্ষ্মীর কথা স্মরণ রাখিয়াও বলা যায় যে, উপন্যাসটিতে নায়ক শ্রীকান্তের বৃত্তে একদল নরনারীর চলমান জীবনের টুকরো সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই জন্য 'শ্রীকান্ত' যাহা দেখিয়াছে বা অনুভব করিয়াছে তাহা তাহার জবানীতে বিবৃত হওয়ায় উপন্যাসের গতি সম্ভাব্যতার নিরিখে ব্যাহত হয় নাই ।" [১৬]

হাস্যরসযুক্ত কৌতুকপ্রবণ মনের পরিচয় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, যার স্বাদ নিতে পাঠককে উপন্যাসের বেশি ভেতরে প্রবেশ করতে হয় না। এই রস-রসিকতা উপন্যাসের বাস্তবদিকের প্রতীতি জন্মাতে পাঠককে বিশেষ সাহায্য করে। শ্রীকান্তের স্বগতোক্তি এই উপন্যাসে অনেক আছে। মাঝে মাঝে এমন কয়েকটি পাঠকের চোখে পড়ে, যাতে হাসি সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার এমনটিও আছে তাতে একাত্মবোধে পাঠকের সহানুভূতি ও দুঃখে চোখে জলও এসে যায়। যেমন, নৈরাশ্যে শ্রীকান্তের স্বগতোক্তি —

> "রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম। ...... আজ তাহার চিত্ত ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া পরপারে হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের এক ধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই।"[১৭]

শ্রীকান্ত উপন্যাসে পত্র ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে — তবু প্রসঙ্গত দু'খানা গুরুত্বপূর্ণ পত্র সম্পর্কে আবার একটু আলোচনা করা হচ্ছে। অন্নদাদিদি (প্রথম পর্ব) ও রাজলক্ষ্মীর (চতুর্থ পর্ব) আখ্যান যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে শ্রীকান্ত বিবৃত করেছে। কিন্তু যার সম্বন্ধে কথা, সেই বোধ হয় সবচেয়ে প্রকৃষ্টভাবে সেই বিষয়ে বলার অধিকারী। মনে হয় এই বোধে চালিত হয়েই অন্নদাদিদির গোপনীয় আত্মকথা পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অন্নদাদিদির চিঠির (শ্রীকান্তের স্মরণসম্ভব) অবতারণা খোলাখুলি ভাবে করেছেন। অনুরূপভাবে চিঠির মধ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মীও নিজের গোপন প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছে। এই চিঠির প্রভাব, পাঠকদের মনে যতটা কার্যকরী হয়েছে, শ্রীকান্তের বিবৃতির মধ্য দিয়ে তা নিশ্চয়ই ততটা সাবলীল ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত না। তাছাড়া সম্পর্কভেদে পত্র দু'খানার রচনা পার্থক্যে ঔপন্যাসিকের মুন্সিয়ানা তারিফ করার মতো। এই পার্থক্যই, বলা যায়,

উপন্যাসের বাস্তবতা-বিষয়ে বেশি করে বিশ্বাস জন্মিয়েছে পাঠকের মনে। অন্নদাদিদির চিঠিতে যে ভাব-ভাষা ও রচনাশৈলী বালক শ্রীকান্তের উপযুক্ত করে শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেছেন — সেটা নিশ্চয়ই প্রেমিকের কাছে লেখা চিঠিতে প্রেমিকা রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে আশা করা যায় না। সমালোচকের এই সম্পর্কে একটু বিস্তৃত মন্তব্য —

> "উভয় রমণীই চিঠি লিখিয়াছে গভীর আবেগের প্রেরণায়। অন্নদাদিদির কথা প্রকাশ পাইয়াছে সরল সহজ কথার মধ্য দিয়া। অন্নদাদিদি তাঁর নিজের কাহিনী প্রকাশ করিতেই ব্যস্ত, তাহাকে অলঙ্কৃত করিতে চাহেন না। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গে তাঁহার ভাষার অনাড়ম্বরতা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর পত্রে এই নিরাভরণ ঐশ্বর্যের পরিচয় নাই। রাজলক্ষ্মী মনে মনে জানে অনুমতি ব্যতিরেকে শ্রীকান্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; কাজেই শ্রীকান্তের সম্বন্ধে আশঙ্কাও এখন তাহার কাছে ঐশ্বর্যের মত। সে তাহার মনের কথাকে বাড়াইয়া গুছাইয়া অলঙ্কার সমৃদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজলক্ষ্মীর পত্রের প্রধান লক্ষণ ভাষার ঘন-হরতা ও বৈদগ্ধ। শরৎচন্দ্রের রচনার ইহা একটি সুন্দরতম নিদর্শন।" [১৮]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আখ্যানের বিস্তৃত ব্যাপ্তির সঙ্গে রয়েছে বহু চরিত্র। প্রথম দু' পর্বের শ্রীকান্তের বিবৃতিতে, শরৎচন্দ্র এমন কৌশল গ্রহণ করেছেন, তাতে পাঠকের মনে হয়, ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শ্রীকান্ত তা বিবৃত করে যাচ্ছে — ভ্রমণকাহিনীতে যেমন দেখা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব সে তুলনায় যেন বেশ মন্থর — প্রথম দু'পর্ব ভ্রমণ কাহিনী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব উপন্যাস বলেই। এই জন্য প্রথম দু'পর্বের সঙ্গে পত্রোপন্যাসের মিল লক্ষণীয়। আত্মকথনরীতির উপন্যাসের কথকতায় সজীবতা ও সাবলীলতা পাঠকের মনকে সহজেই জয় করে নেয় বলে তা পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে থাকে। আর অনবদ্য বাহুল্যবর্জিত মাধুর্যময় সহজ সরল মরমী ভাষা, রূপ দেয় উপন্যাসের সজীবতা, বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে। শরৎচন্দ্রের রচনা-শৈলীর যে জীবন-বাস্তবমুখীনতা, তার পিছনের যাদুটি হচ্ছে এই বিশেষ ধরনের গদ্য-ভাষা ব্যবহার। সমালোচকের মতে —

> "শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক গদ্যরীতি আলোচনাকালে আমরা যেন মনে রাখি, তিনিই প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক যিনি পাত্র পাত্রীদের সামাজিক শ্রেণীগত বাচনিক বাস্তবতা রক্ষার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। নায়েব, চাষা, মিস্ত্রি, গ্রাম্য স্ত্রীলোক, চাকর, চাপরাশি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাচনিক বাস্তবতার মাধ্যমেও জীবন্ত।" [১১]

আখ্যানকথনের জন্য তিনি সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কথোপকথনের ভাষা চলিতে — যা উপন্যাসকে বাস্তব-সম্মত করে তুলেছে। সমালোচকের মতামত —

> "শরৎচন্দ্রের রচনারীতির একটি প্রধান গুণ বাস্তবপ্রিয়তা। শরৎচন্দ্রের অনুভূতির সঙ্গে রোমান্টিক কবির অনুভূতির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনা, তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ, অনুপরমাণুব্যাপী পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁহাকে রিয়্যালিস্ট বা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক পদবাচ্য করিয়াছে। তাঁহার ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে।" [২০]

একতরফা ভাবে চিঠি লিখে লিখে অনেকটা আত্মকথন ভঙ্গীতেই পত্রোপন্যাস রচিত হয়েছে; উদাহরণ — সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার'।

আত্মকথনরীতিতে লেখা 'স্বামী' একটি ছোট্ট উপন্যাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকা 'নারায়ণ' -এর জন্য শরৎচন্দ্র এই কলমায়েসী উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। দেশবন্ধুর বৈষ্ণব আদর্শের কথা মনে রেখেই, বৈষ্ণব-ধর্মে অনুরক্ত, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রাতিস্বাতের আদর্শে সতীধর্মের প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই যেন শরৎচন্দ্র একটি বিপথগামী বিবাহিতা নারীর অনুতপ্ত হৃদয়ের আলেখ্য, নায়িকার স্মৃতিচারণার ভিতর দিয়ে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। দাম্পত্য-জীবনে পদস্খলিতা নারীর স্বামী-সংস্কার যে জন্মান্তরেও কত বড় রক্ষাকবচ তা নায়িকা সৌদামিনীর কিছু উক্তির মধ্যে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক —

> "... আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে মন উঠল না। .... কিন্তু দাম আমাকে দিতে হল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য ..... ন্যায়-অন্যায়ের মালিক তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই

> দিলেন না। .... আমাকে পথে বার করে দিলেন, ... তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেছিস কি ? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায় ? .... এ জন্মে হোক আগামী জন্মে হোক .... তাঁকে যে তোর চাই। তুই যে তাঁরই।"[২১]

প্রাক-বিবাহিত জীবনে প্রেম করে, সেই কৃত-কর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের মুক্তি পথ খুঁজছে বিবাহিতা নায়িকা সৌদামিনী, বার বার এমনি ভাবে স্বগতোক্তির ধিক্কার-বাক্য উচ্চারণ করে। পাপ-স্খালনের প্রয়াসেই যেন সৌদামিনীর আরো খানিকটা স্বগতোক্তি —

> "একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে ; তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল। সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে ?"[২২]

ক্ষুদ্র অবয়বে সরল একমুখী উপন্যাসের আখ্যান, নায়িকার আবেগ-উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনা অকৃত্রিম সত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'স্বামী'তে। সহজ-সুন্দর আন্তরিক চলিত ভাষা আত্মকথনরীতির এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাসটিকেও আস্বাদ্য করে তুলেছে সন্দেহ নেই। কয়েকটি পত্রের ব্যবহার, কাহিনীর গতিকে জটিল করেছে সত্য কিন্তু চরিত্র বিকাশে তাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। আত্মকথনরীতি এই উপন্যাসে সার্থকই বলা যায়, আরও এই জন্য যে, অতীতে ঘটে যাওয়া আখ্যান, স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হলেও, উপস্থাপনে বিশেষ মুন্সিয়ানা থাকায় তাতে ঘটমান বর্তমান কালের সজীবতা পাঠকের মনে সত্যতার বিশেষ প্রত্যয় জন্মাতে সাহায্য করেছে ; আর এই জন্যেই পত্রোপন্যাসের সঙ্গে এর আত্মিক মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমনটি আমরা 'ইন্দিরা' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখেছি। আর মনে হয়, 'ইন্দিরা' উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই যেন শরৎচন্দ্র 'স্বামী' উপন্যাসে আত্মকথন রীতি গ্রহণ করেছিলেন, যদিও উপন্যাসের একটা অন্তর্প্রেরণা এই রীতির প্রতি প্রচ্ছন্ন ছিল, বলা যায়।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ও আকর্ষণযোগ্য আত্মকথন ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', রচিত। উপন্যাসের নায়িকা অন্ধ রজনীসহ অন্যান্য প্রধান চরিত্র, অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র নিজের নিজের আত্মকথাকে অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতায় উপস্থিত করেছে। উপস্থাপনার এই নতুন ভঙ্গী দিয়ে যে পাঠক-মন ভোলাতে চান নি, যথার্থ উপন্যাসের আন্তর্প্রেরণাতেই যে তিনি আত্মকথনরীতি ব্যবহার করেছেন, তারই যেন কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রজনীর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —

> "প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত ' Last Days of Pompeii ' - নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কানা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়, যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।
>
> "উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা .... নূতন নহে। .... এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।"

প্রসঙ্গত চরিত্র বিশেষের আত্মকথনরীতিতে 'রজনী' উপন্যাসকে উপস্থাপনায় প্রথম কারণ-টির ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট সমালোচকের মতামত উদ্ধৃত করা যায় —

> ".... যাহার চক্ষু নাই তাহার ... অনুভূতির অভিব্যক্তি হয় ইন্দ্রিয়ের মারফতে এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সে রস সংগ্রহ করে। যাহার চক্ষু নাই, তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণত খুব প্রখরতা লাভ করে। ...... ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই উপলব্ধিকে রূপ দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্ব্ব প্রধান। সুতরাং চক্ষুহীনের উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি হইবে সম্পূর্ণরূপে অনন্যসাধা-রণ। ....

"বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধের উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন । .... বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মানসিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের জন্য ।... রজনীর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী ; .... অন্ধের অনুভূতি যাহাতে সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হইতে পারে সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই কাহিনী বর্ণনা করেন নাই ; রজনীই তাহার কথা বলিয়াছে ।"[২৩]

দ্বিতীয় কারণটির ব্যাখ্যায় বলা যায়, আত্মকথনরীতিতে নায়ক বা নায়িকার একমুখী কথকতায় নিজের অবানবন্দীর ভিতর দিয়ে নিজের দ্বন্দ্বমুখর চরিত্রের সামগ্রিক উদ্‌ঘাটন কিন্তু সব সময় হয়ে ওঠে না । উপরন্তু ঔপন্যাসিকের অন্যান্য চরিত্র উন্মোচনেও এক-জন কথকের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে তা যথার্থভাবে প্রস্ফুটিত হতে অনেক বাধা । তার চেয়ে বরং যদি প্রধান চরিত্রগুলি পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের পারস্পরিক অন্তরের কথা নিজের মুখেই বলে যায় তবে তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোতে চরিত্র-গুলি নানা-রঙে রশ্মিত হয়ে উঠতে পারে । এটা ঠিকই যার যার অভিজ্ঞতার কথা তার তার মুখেই চমৎকার ভাবে খোলে । তৃতীয় কারণের ব্যাখ্যায় বলা যায়, সর্বজনীন সত্য বলে ঔপন্যাসিক অপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করেননি ; মানুষের সাধারণ বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন মাত্র । আমাদের মনে হয়, পূর্ববর্তী আত্মকথনরীতির উপন্যাস 'ইন্দিরা' রচনা করতে গিয়ে তিনি এক কথক চরিত্রের কথনের অসুবিধা দূর করার জন্য একাধিক কথকের আশ্রয়ে 'রজনী' উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন ।

রজনীর জীবন ঘিরে শচীন্দ্র — অমরনাথের ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বপূর্ণ ত্রিভুজ প্রেমই উপন্যাসের প্রধান বিষয় । যদিও অমরনাথ-লবঙ্গলতার একটি উপ-কাহিনী উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে । উদ্‌ভিন্ন যৌবনা অন্ধ ফুলওয়ালী রজনীর অন্তরের গোপন রহস্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-অনুভবময় জগৎ ও শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগ ; অমরনাথের উদাসীন, সংসার-বিমুখ, তত্ত্বজিজ্ঞাসুমন ও মহানুভবতা ; রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের প্রীতি ও অনুরাগ ; লবঙ্গলতার মনের দ্বন্দ্ব ও গোপনীয় ব্যর্থ প্রেম, উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্রের পৃথক পৃথক ভাবে আত্মকথায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে । এই রীতিতে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূচনাকারী উপন্যাস লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে । কথকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে চরিত্রগুলি আখ্যানের

ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটায় ঔপন্যাসিককে সব সময় সেই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়েছে। তাঁর নির্দেশেই যেন যার যতটুকু বলার সে ততটুকু বলেছে এবং যে চরিত্র যে ঘটনায় প্রাধান্য পেয়েছে, সেই চরিত্রই সেই ঘটনার বিবৃতিকার। তাই উপন্যাসে দেখা যায়, রজনী বলছে, " এ যন্ত্রণাময় জীবন চরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে", শচীন্দ্রনাথ তার কথকতার প্রারম্ভে বলছে, " এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে — রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে।" অমরনাথ বলছে, "এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে।" চরিত্র-গুলির এই বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, উপন্যাসের ঘটনা সংঘটিত হবার বেশ পরে, উপন্যাসটি তার লিখিত রূপ পেয়েছে এবং বলাই বাহুল্য, প্রত্যেক কথকই, একে অপর সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তাদের কথকতার বাচনভঙ্গী ও ভাষা ব্যবহারে যাতে পার্থক্য বজায় থাকে সেই দিকে ঔপন্যাসিক সচেতন ছিলেন। "রজনী' উপন্যাসের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সমালোচকের মতামত —

> "'রজনী'তে বিভিন্ন বক্তা ও বক্তৃনীর মধ্যে ভাষাগত বিশেষ কোন পার্থক্য রক্ষা করা হয় নাই — স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের মুখেই একরূপ ভাষা ধ্বনিত হইয়াছে, সে ভাষা লেখকের নিজের ভাষা হইতে অভিন্ন। অবশ্য বঙ্কিম যে এরূপ একটা প্রভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে; রজনীর তীক্ষ্ণতা, অমরনাথের দার্শনিকোচিত চিন্তাশীলতা, শচীন্দ্রের ভিন্ন প্রকৃতির বুদ্ধি-মত্তা, নবকুমারের রমণীসুলভ স্নেহশীলতা ও অতিপ্রকৃতে বিশ্বাসপ্রবণতা — এই প্রবৃত্তিগুলির বিশেষ প্রভাব তাহাদের মুখনিঃসৃত ভাষাতে প্রতিফলিত করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।" [২৪]

ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে খানিকটা বিরূপ মন্তব্য করলেও সমালোচনার শেষে তিনি আত্মকথন-রীতির এই উপন্যাস সম্পর্কে আরও বলেছেন —" গঠনকৌশলের দিক দিয়া 'রজনী'তে বঙ্কিমের কৃতিত্ব সামান্য নহে।" [২৫] উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে পত্রোপন্যাসের রচনারীতির সঙ্গে আত্মকথনরীতির 'রজনী'র যিল আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস আত্মকথনরীতিতে রচিত। নায়ক (নিখিলেশ), নায়িকা (বিমলা) ও উপ-নায়ক (সন্দীপ), প্রত্যেকেই বক্তা হিসেবে 'আমি' 'আমি' করে যার যার নিজের আখ্যান 'আত্মকথা'য় লিপিবদ্ধ করেছে। তাদের জীবনে যখন যেমন যেমন ঘটনা ঘটেছে, তারা প্রত্যেকেই পুনরুক্তি এড়িয়ে (ঔপন্যাসিকের বিশেষ মনস্কতায়) সেই সেই ঘটনা ব্যক্ত করেছে। বিমলার আত্মকথায় অতীত দিনের স্মৃতিচারণার লক্ষণই প্রকট। যেমন, আত্মবিশ্লেষণে প্রয়াসী বিমলার প্রথম বারের আত্মকথার আরম্ভ —"মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ — শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল।" কিন্তু নিখিলেশ বা সন্দীপ তাৎক্ষণিক ঘটনাই পর পর লিপিবদ্ধ করায় তা ডায়েরিধর্মী হয়ে পড়েছে। বিমলার আত্মকথার কিছু কিছু অংশও ডায়েরি লক্ষণাক্রান্ত। উদাহরণ —

ক) নিখিলেশের কথা —"তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে রাখা ভালো।" [২৬]

খ) সন্দীপের কথা — "খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম।" [২৭]

গ) বিমলার কথা — "তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।" [২৮]

এবং ডায়েরিতে লেখার যে ধরণ অনুসৃত হয়, অর্থাৎ খণ্ডিত ক্ষুদ্র অবয়বে অবিন্যস্ত ও উদ্দেশ্যহীন এক একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ইত্যাদি; নিখিলেশ ও সন্দীপের ডায়েরির অধ্যায়গুলি তেমন ছোট আকারের নয় — তাছাড়া তাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা সুনির্বাচিত এবং উপন্যাসের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির তাগিদে তারা বিধৃত ও বিন্যস্ত তাদের আত্মকথায়। ফলে well-made-novel -এর স্থিতির বজায় থেকেছে উপন্যাসে।

নায়িকা বিমলা; আত্মকথার প্রথম ও শেষ অংশের লেখিকাও সে। কাহিনীর অগ্রগতিতে সে-ই সবচেয়ে বেশি সচেতন এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত। অবশ্য উপন্যাসের কাহিনী বলতে, সমালোচকের ভাষায় —

"কীভাবে সন্দীপের 'দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি' আর 'কৌতূহল' বিমলাকে

> সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট করল, আর কী ভাবে অমূল্যর প্রতি জাগ্রত মাতৃত্ব তাকে ফিরিয়ে আনল নিখিলেশের কাছে — এই তো কাহিনী ।"[২৯]

ভঙ্গী দিয়ে পাঠকদের চোখ ভোলানোর জন্য নয়, ঘরে-বাইরে উপন্যাসের একান্ত অন্তর প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ আত্মকথনরীতির প্রয়োগ করেছেন । সেই প্রয়োজন সমালোচকের ভাষায় —

> "... ঘরে বাইরে'তে উত্তমপুরুষের ব্যবহার যেমন নিছক বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য নয়, অবশ্যই বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সার্থক প্রকাশের অনিবার্য আকর্ষণে । ..... তিনজনের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগও নিতান্ত আঙ্গিকের নূতনত্ব সৃষ্টির মোহে নিশ্চয় নয়, তার চেয়ে গূঢ়তর কোনো তাৎপর্যের টানে — জীবন ও শিল্পের আরো গভীরতর সংশ্লেষের প্রকাশ-ব্যাকুলতায় ।"[৩০]

উপন্যাসের গঠন-কৌশলে তিনজনের জবানবন্দী, বিশেষ কোন ক্রম অনুসরণ করেনি । উপন্যাসের প্রয়োজনে যখন যার বলার পালা জরুরী হয়ে পড়েছে, তখনই তাকে দিয়ে কথকতা করিয়েছেন ঔপন্যাসিক । ঔপন্যাসিক খুব কৌশলে এটা করিয়েছেন বলে, উপন্যাসের আখ্যান কখনোই কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে নি, বরং উপন্যাসের নির্মাণ-কৌশলে ঐক্য বজায় থেকেছে । ডায়েরির কিছু কিছু খণ্ড অংশ প্রয়োগে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে মোটামুটি সফলতা আসায় রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত আত্মকথনরীতির আঙ্গিকে রচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই মনে হয় ।

'ঘরে - বাইরে' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের আদর্শায়িত বক্তব্য হল, দাম্পত্য জীবনে স্বামী (নিখিলেশ) স্ত্রীকে (বিমলা) ঘরের (সাংসারিক জীবনে স্ত্রীরূপে) ভূমিকাতেই শুধু দেখতে চায় না — বাইরের (বৃহৎ জগতের পটভূমিকায় ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী-রূপে) জগতের মধ্য দিয়েও তাকে পেতে চায় । স্বামী নিখিলেশ আরো চায়, স্ত্রী বিমলাও যেন তাকে শুধু স্বামী হিসেবে নয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষরূপেও গ্রহণ করে । এর ফলে, তাদের দাম্পত্য-জীবনে স্বদেশ-সেবকরূপী (?) নীচ অর্থগৃধ্নু তৃতীয় ব্যক্তি সন্দীপের অনুপ্রবেশ ঘটে । উদার-হৃদয়ের অধিকারী নিখিলেশ, বিমলা সম্পর্কে তাঁর আকাঙ্ক্ষা (যা জুয়া খেলার সামিল) চরিতার্থ করতে গিয়ে বড় বেশি দাম দিয়ে ফেলে । ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে সে দেউলে হয়ে যায় । উপন্যাসটিতে পুরুষ ও নারীর অন্তর্লোকের রহস্যের

কথা জানা যায় ।[৩২] তাই বোধ হয় আত্মজীবনী লিখতে তিনি উৎসাহ বোধ করেন নি । তবে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মতত্ত্ব দর্শন তাঁর রচনার মধ্যে খুঁজে পেতে পাঠকদের অসুবিধা হয় না । প্রবন্ধের কথা বাদ দিলেও কমলাকান্ত (কমলাকান্তের দপ্তর), হরদেব ঘোষাল (বিষবৃক্ষ) ও অমরনাথ (রজনী) ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম-আদর্শ প্রস্ফুট ।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র । সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন — এটা খানিকটা সম্ভব হয়েছে সাময়িক পত্রিকা (বঙ্গদর্শন) সম্পাদনার ভার নিজে গ্রহণ করেছিলেন বলে । অনেক সময় সাময়িক পত্রিকার পাতা ভরানোর জন্যও সম্পাদককে নামে-বেনামে নিয়মিত অজস্র লেখা লিখে যেতে হয় । এই সুযোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটাও ঘটে যায় । 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' উপন্যাসে প্রকাশভঙ্গীর যথার্থতা জানার জন্য তিনি experiment করেছেন । আত্মকথনরীতিতে তাঁর লেখা 'ইন্দিরা' যতটা সার্থক ভাষাগত দিক থেকে 'রজনী' ততটা নয় । 'রজনী'র পাত্র-পাত্রীর ভাষা ব্যবহারে তাদের চারিত্রিক স্বকীয়তা তিনি বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও তা তেমন পারেন নি । "ইন্দিরা' হালকা চালের ক্ষুদ্র অবয়বে কৌতুকপ্রবণ উপন্যাস হওয়ায় — আত্মকথনরীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে । এই সার্থকতার সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বোধ হয় তিনি এই রীতিতেই 'রজনী' লিখতে আগ্রহী হন । তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকগণ কিছু উপন্যাসে আত্মকথনরীতি সামান্যই অনুসরণ করেছেন ।[৩৩] আবার যতটুকু করেছেন, তার পিছনে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব । বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন । মনে হয়, তিনি স্যামুয়েল রিচার্ডসন প্রমুখের ইংরেজী পত্রোপন্যাসের খবর রাখতেন । তাছাড়া ইংরেজী উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন । বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে পত্রের বহুল বিচিত্র ব্যবহার দেখে তাই মনে হয় । উপন্যাস রচনায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেও বঙ্কিমচন্দ্র পত্রোপন্যাস রচনায় আগ্রহী ছিলেন না । মনে হয় তিনি আত্মকথনরীতির উপন্যাস রচনায়, বিশেষ করে 'রজনী'তে বিশেষ বড়ো একটা স্বাচ্ছন্দ্য পাননি বলে তিনি যেমন এই রীতির পুনরাবৃত্তি ঘটান নি এবং পূর্বেকার 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণ নিয়েই পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন ; তেমনি

আত্মকথনরীতির প্রায় সমগোত্রীয় জটিল রীতির কোন পত্রোপন্যাসও রচনা করতে চান নি । তাছাড়াও পত্রোপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের একান্তই ভালো-মন্দে মেশানো নিজেদের গোপন স্বগতোক্তিকে বে-আব্রু করে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাপা স্বভাবের নীতি-বাদী বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি বাধ সাধতে পারে । এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, তিনি ডায়েরি লিখতেন না, আত্মজীবনীও লেখেন নি । ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রেও নিজেকে উজাড় করে তুলে ধরার প্রবণতাও দেখা যায় না এবং আত্ম-প্রচারেও তিনি বিমুখ ছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মাঝে মাঝে ডায়েরি লিখেছেন ; চিঠি-পত্রও লিখেছেন তিনি সংখ্যাতীত । আত্মজীবনীর পরিচয়বহ 'জীবনস্মৃতি' , 'ছেলেবেলা' ও 'আত্মপরিচয়' লিখেছেন খুবই সংযতভাবে । কথাসাহিত্যে, রবীন্দ্র-আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশে অজস্র রচনার মধ্যে উপন্যাস 'গোরা' অন্যতম । পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে চিঠিপত্রের বিরাট ভূমিকাও ব্যবহারের বিষয় আমরা আলোচনা করেছি । বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা করেন নি, [৩৪] সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বিশেষ ধরনের অত্যাধুনিক উপন্যাস রচনার তাগিদে আত্মকথনরীতির দু'টি উপন্যাস লিখেছেন — বলাই বাহুল্য তারা সার্থক সৃষ্টির হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও এই রীতি পরিত্যাগ করে 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণ থেকেই পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন । তিনিও ইংরেজী পত্রোপন্যাসের খবর রাখতেন ধরা যেতে পারে কিন্তু কোন পত্রোপন্যাস রচনা করেন নি । হয়তো তাঁর মনে এই ধরনের উপন্যাস লেখার তাগিদ আসেনি আর এই রীতির বৈশিষ্ট্যে সার্থক উপন্যাস রচনায় তিনি সন্দিহান ছিলেন এমনও হতে পারে । অথবা এও হতে পারে, আত্মকথনরীতির উপন্যাস রচনা করার পরে পত্রোপন্যাস রচনার সার্থকতা আছে বলে তাঁর মনে হয় নি । আমাদের ধারণায় — তিনি বিভিন্ন দিকের (যেমন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা-ইতিহাস ইত্যাদি) নানা বিষয় নিয়ে এতো বেশি চিঠি-পত্র লিখেছেন, তার উপরে আবার পত্রাকারে নতুন করে উপন্যাস রচনা করার প্রয়োজন তার কাছে ধরা পড়ে নি । তাছাড়া এমন কোন কাহিনীর উপন্যাস লেখার অন্তর্প্রেরণা তাঁর মনে জাগেনি যার গঠন পত্রাকারে হলে প্রকাশ মাধ্যমটি সর্বোত্তম হতো । তবে এ সবই আমাদের জল্পনামাত্র ।

পত্রোপন্যাস না লিখলেও বাংলা সাহিত্যে পত্রোপন্যাস রচনার পরোক্ষ পথ রবীন্দ্রনাথ তৈরী করে গেছেন "চতুরঙ্গ" ও 'ঘরে-বাইরে' লিখে । কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'রজনীর' মতো রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি উপন্যাসে পত্রোপন্যাসের বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এ ছাড়া তাঁর পত্রাকারে লেখা 'শ্রীর পত্র' গল্প, প্রত্যক্ষভাবে পরবর্তীকালের লেখকদের এ জাতীয় লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে বলা যায় ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথেই শরৎচন্দ্রের তাবৎ উপন্যাস রচিত । উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গী নিয়ে তিনি কোন বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি । উপন্যাস রচনায় স্বকীয়ভঙ্গীতে একটি বাস্তব 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিতেন শরৎচন্দ্র, তাতে থাকত এমন চমৎকার জমাটি কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টিতে থাকত রক্তমাংসের মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরূপ এবং ভাষা প্রয়োগে থাকত সহজ সরল সজীব ভাব, যার দ্বারা তিনি পাঠককে মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন । এখনকার দিনের পাঠকও একবার তাঁর উপন্যাস পড়া শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়তে পারে না । পাঠক-মনোরঞ্জক উপন্যাসের এমন সুন্দর 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণের নির্মাণকৌশল আয়ত্ত করার পর, তাকে ছেড়ে অন্য কোন প্রকাশরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তিনি ভাববার অবকাশ পান নি । ওই এর ফলে তিনি ঔপন্যাসিক জীবনে "শ্রীকান্ত" ও 'স্বামী' ছাড়া অন্যান্য উপন্যাস রচনায় 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণ থেকে সরে আসেন নি । তবে এটা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার যেটে যা সৃষ্টি করেন নি, সেই আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস কিন্তু শরৎচন্দ্র লিখেছেন, হয়তো এটা ঘটনাচক্রে রচিত হয়েছিল — পরিকল্পিত ভাবে নয় । আত্মকথনরীতির 'শ্রীকান্ত' রচনার শেষার দিকে উপন্যাস রচনা করছেন এই মনোভাব তাঁর ছিল না (ছিল ভ্রমণ কাহিনীর মনোভাব) বলে একে তিনি ভ্রমণ কাহিনীরূপে অখ্যাত করেছিলেন । পরে তিনি চার পর্বের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপায়ণে এর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন । 'শ্রীকান্ত' রচনার প্রথম থেকেই যদি তাঁর উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা থাকতো তবে তিনি তাঁর উপন্যাসের জমাটি 'সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা-শৈলী পরিত্যাগ করে, আবার ঝুঁকি নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আত্মকথনরীতি গ্রহণ করতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক । আত্মকথনরীতিতে লেখা 'স্বামী'কে অনেকেই উপন্যাস বলতে নারাজ। তাদের মতে এটাকে বড় গল্পের সম-গোত্রীয় বলা যায় যাত্র । দাম্পত্য জীবনে ভুল পথে পা-বাড়ানোর

জন্য একটি অনুতপ্তা নারীর আত্মালোচনার কাহিনী এই 'স্বামী' । নিজের মুখে কলঙ্কের স্বীকারোক্তি (Confession) করে সে নিজের পাপ স্খালন করতে চেয়েছে — এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রচনা-শৈলীর দিক থেকে আত্মকথনরীতির 'স্বামী' সার্থক রচনা । 'ইন্দিরা' অনুসরণে শরৎচন্দ্র যে 'স্বামী' লিখেছিলেন তা অনুমান করা গেলেও উপন্যাস হিসেবে তা অকিঞ্চিৎকর রচনা, এটা আমরা আগেও বলেছি । বলা যায়, উপন্যাসের রচনা-শৈলীর দিক দিয়ে তাঁর ব্যবহৃত গতানুগতিক পথেই তিনি চলেছেন । পত্রাকারে রচিত উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে কি-না এটা তিনি পরখ করে দেখার অবকাশ পান নি । বাংলা সাহিত্যে পত্রাকারে প্রথম উপন্যাসটি [৩৬] লেখা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরই সমসাময়িক কালে এবং তাঁরই প্রেরণায় ।[৩৭] রবীন্দ্রযুগের ঔপন্যাসিকগণ পত্রোপন্যাস লেখার কথা তেমন ভাবেন নি । তবে কাজী নজরুল ইসলাম পত্রাকারে বাঁধন হারা (১৯২৭) নামে একটি উপন্যাস লেখেন । এই কালের পত্রোপন্যাস রচনার পিছনে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' ও 'স্ত্রীর পত্র' এবং শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ও 'স্বামী'-র প্রত্যক্ষ প্রেরণা কাজ করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । যেসব ঔপন্যাসিক পত্রোপন্যাস লিখেছেন তাঁরা নিজেদের আঙ্গিকে প্রেরণায় বিচ্ছিন্নভাবে উপন্যাসের দেহে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় তা করেছেন । একজন লেখক অপরের লেখা পত্রোপন্যাসের খবর রাখতেন, এটা ধরে নেওয়া যায় । তবু বলতে বাধা নেই বাংলা সাহিত্যে ১৮৮২ খ্রী: প্রকাশিত প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস 'রমণকুমারের পত্র' রচিত হলেও তার অনুসরণে পরবর্তীকালে পত্রোপন্যাসের ধারাবাহিক কোন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি । বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে পত্রোপন্যাসের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস তাই রচিত হয়নি ॥

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেক: প্রজাপতি:" — দ্র: ধ্বন্যালোক ।

২. "লেখক সর্বশ ও সর্বজ্ঞ, স্বয়ং বিশ্ববিধাতার অনুকারক" —

রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য (১৯৫৫) — বুদ্ধদেব বসু ; পৃ: ১১০

৩. শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র (১৯৭১) — মোহিতলাল মজুমদার ; পৃ: ২৮৬

৪. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার (১৯৬৭) — অজিতকুমার ঘোষ ; পৃ: ২১১ ।

৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২) — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ১১০

৬. বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড । সমগ্র উপন্যাস) ; (১৩৭৬) ; সাহিত্য সংসদ ; ভূমিকা — উপন্যাস-প্রসঙ্গ ; পৃ: ৩৫

৭. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৮০) — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ১৪

৮. বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ (১৯৮১) — অশ্রুকুমার সিকদার ; পৃ: ১০১

৯. চতুরঙ্গ (দামিনী ২) ; র.র., ৯।৩৮১-৩৮২

১০. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক — ৩য় খণ্ড (১৩৬৮) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃ: ৪১৩

১১. বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৭) — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ; পৃ: ৩৯ ।

১২. "চলতি ভাষার আত্মিক গুণ রবীন্দ্রনাথ এতে সঞ্চারিত করেছেন, শুধু চেহারাটা রেখেছেন সাধুভাষার ।"

রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (১৯৮৩) — বুদ্ধদেব বসু ; পৃ: ৮৪

১৩. রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প (১৯৮৪) — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃ: ২২৩-২২৪ ; ২২৬ ।

১৪. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার (১৯৬৭) — অজিতকুমার ঘোষ ; পৃ: ২০৭

১৫. শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র (১৯৭১) — মোহিতলাল মজুমদার ; পৃ: ১০

১৬. শরৎচন্দ্রের চিন্তা-জগৎ ও তাঁহার সাহিত্য (১৯৭৯) — শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ২৯৫

১৭. শরৎ রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সং.); শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব; শরৎ সমিতি, পৃ: ২৪৪

১৮. শরৎচন্দ্র (১৩৬২) — সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; পৃ: ১১০

১৯. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৮০) — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ২৫২

২০. শরৎচন্দ্র (১৩৬২) — সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; পৃ: ১১০

২১. স্বামী, শরৎ রচনাবলী (জন্মশত বার্ষিক সং.)— শরৎ সমিতি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩

২২. তদেব

২৩. বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সং.) — সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; পৃ: ১৩৩-১৩৪

২৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২)— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ: ১১৩

২৫. তদেব ; পৃ: ১১৫

২৬. ঘরে-বাইরে (নিখিলেশের আত্মকথা) ; র.র., ১।৪৩

২৭. ঘরে-বাইরে (সন্দীপের আত্মকথা) ; র.র., ১।৪৯

২৮. ঘরে-বাইরে (বিমলার আত্মকথা) ; র.র., ১।৪২৫

২৯. বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ (১৯৮১) — অম্লকুমার সিকদার ; পৃ: ১১৩

৩০. রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প (১৯৮৪)— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ; পৃ: ৩৩

৩১. বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ (১৯৮১)— অম্লকুমার সিকদার ; পৃ: ১০২

৩২. "বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার চাপা অধরোষ্ঠে, যে অধরোষ্ঠের উপরে ডিমোস্থিনেসের খড়্গের মত নাকটা ঝুলিতেছে। ওই চাপা ওষ্ঠ ভেদ করিয়া নিজের একটি কথাও তিনি বলেন নাই — বহুলোকের কথা বলিয়াছেন, কেবল নিজের ছাড়া।"

মাইকেল মধুসূদন (১৩৭৩)—প্রমথনাথ বিশী ; পৃ: ১২০, (জীবনভাষ্য)।

৩২ক. "জীবন আমার, তা লিখিয়া কি হইবে ?... জীবনে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে। ... আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। ... আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে, কী এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল।"

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সম্পাদিত — (নবপত্র প্রকাশন সংস্করণ, ১৯৮২ ; পৃ: ১১১)।

৩৩. "সমকালে এই রীতিতে রচিত কয়েকজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।" পাদটীকা —

ক. সতীশচন্দ্র বসু : পল্লীগ্রাম (১৮৯২) ;

খ. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : অদৃষ্ট (১৮৯২) ;

গ. পঞ্চানন রায়চৌধুরী : কুলকলঙ্কিনী বা কলিকাতার গুপ্ত কথা (১৯০০);

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক (১৯৭৪) — রামদুলাল বসু ; পৃঃ ২৫১

৩৪. "আত্মজীবনীঘনত্ব উপন্যাস রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মসচেতনতায় সম্ভব ছিল না ।"

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৮০) — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ২৩১

৩৫. "তাঁর (শরৎচন্দ্র) সারা জীবনের উপন্যাস সাধনায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের যেমন সাহসের সঙ্গে কর্মের ভাঙাচোরায় নেমে পড়তেন, নিরীক্ষায়, তা সে চরিত্রের বিষয়েই হোক, বক্তব্যের বিষয়েই হোক, গল্পের বিষয়েই হোক তাঁর যেমন প্রয়োজন ছিল অনিবার্য, শরৎচন্দ্রের সে প্রয়োজন ছিল না । 'বড়দিদি' থেকে 'বিপ্রদাস' পর্যন্ত শরৎচন্দ্র গল্পকে শেষ পর্যন্ত মিটোল করে তুলে পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাইতেন ।"

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৮০) — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ২৪৯

৩৬. বসন্তকুমারের পত্র (১৮৮২) — নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৩৭. "নতুন আলোকে দেখা এই উপন্যাসটির প্রেরণা হয়তো বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকগণ (১৯৭৪) — রামদুলাল বসু ; পৃঃ ভূমিকা — ১৮/